শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।

অশেষ গুণসম্পন্ন, ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের

কর কমলে

তদীয় ভক্ত গ্রন্থকারের

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

সমর্পিত হইল।

সূচী।
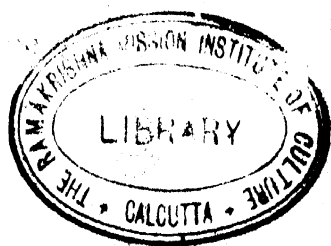
তুকারাম-চরিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত,
অহল্যা বাইএর জীবন চরিত, কবিতা-প্রসঙ্গ
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ
বিরচিত।

সিটী-বুক্ সোসাইটী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

আমাদিগের বংশের মধ্যে

যাঁহার সহিত

আমি

তুকারামের

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য

দেখিতে পাই,

আমার সেই পূজনীয় ভ্রাতা

শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ বসু

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থ

ভক্তি সহকারে

উৎসৃষ্ট হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভক্ত তুকারামের নাম বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভারতীতে লিখিত প্রবন্ধ এবং তৎপরে তাঁহার রচিত বোম্বাইচিত্র হইতে ইহা অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুর লিখিত তুকারাম-চরিত আমাকে উক্ত মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনায় প্রণোদিত করে এবং আমি কৌতূহলী হইয়া, আমার অনুরাগভাজন ছাত্র, সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীমান সখারাম গণেশ দেউশ্‌করের সাহায্যে মূল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে তাহা পাঠ করি। তুকারামের অপূর্ব্ব কাহিনী আমার স্বদেশীয়গণের আরও পরিচিত হউক, এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

প্রথমে "দাসী" পত্রিকায় তুকারাম-চরিত খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমার সঙ্কল্প ছিল যে, তুকারামের জন্মভূমি দেহু, তাঁহার প্রিয়নদী ইন্দ্রায়নী এবং তাঁহার আরাধ্য দেবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র পণ্টরপুর স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিব। কিন্তু সে আশা চরিতার্থ হইবার পথে এক্ষণে বহুবিঘ্ন বর্ত্তমান দেখিয়া

পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। তুকারামের আরও অধিক অভঙ্গের বঙ্গানুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল, আপাততঃ তাহাও স্থগিত রাখিতে হইল। যে গুলিতে তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল অভঙ্গই আমি অনুবাদ করিয়াছি। প্রয়োজন-বোধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদিত তিনটী অভঙ্গ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি; আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সাধুদিগকে তীর্থ-স্বরূপ * বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণের ন্যায় সাধু পুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনাতেও ফল হয়। তুকারাম-চরিত পাঠ করিয়া আমার স্বদেশীয়-গণের একজনও যদি তাঁহার ভক্তি ও বিনয় লাভে এবং তাঁহার ক্ষমাশীলতায় ও স্বার্থত্যাগে উদ্বোধিত হন, তাহা হইলে আমি শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি

নিতাড়া।
ডায়মণ্ড-হারবর। } শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু।

---

* সাধুনাম দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধু-সমাগমঃ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

তুকারাম-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-প্রাণ মহাপুরুষদিগের লীলাভূমি। যুগে যুগে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, এই পুণ্যভূমিকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য, কেহ জীবে অনুকম্পা এবং কেহবা সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা দিয়া, তাঁহাদিগের স্বদেশবাসিগণকে উপকৃত করিয়াছেন। পুণ্য-সলিলা গঙ্গা ও গোদাবরীর প্রবাহের ন্যায় তাঁহাদিগের মুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা তৃষিত ভারতসন্তানদিগের হৃদয়ে এখনও অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গীত পর্য্যন্ত ভারতের সাহিত্য, অধিকাংশই, ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। দেববাষা সংস্কৃতের অপ্র-

চলনের পরও, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে ধর্ম্মভাবোদ্দীপক পদাবলীর অভাব হয় নাই। হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের, বাঙ্গালাভাষায় রামপ্রসাদ সেনের, তামিলে তিরুবল্লিয়ারের এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তুকারামের পদাবলী, ভাবের গভীরতায় ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। ভক্তি কথার প্রচারক বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণ, আপন আপন দেশে দেবানুগৃহীত এবং কুত্রাপি দেবাংশ বলিয়াও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন ইষ্টদেবের উদ্দেশে যে স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, আজ তাহা লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। হিন্দুস্থানে তুলসীদাসের দোহা এবং বঙ্গদেশে রামপ্রসাদের সঙ্গীত না শুনিয়াছেন, বা না জানেন, এমন হিন্দুসন্তান বোধ হয় অতি অল্পই আছেন। বঙ্গের রাজপথে, নদীবক্ষে, নগরে, পল্লীতে, এমন স্থান নাই, যেখানে রামপ্রসাদের সঙ্গীত শ্রুত না হয়। রামপ্রসাদ বঙ্গদেশে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তুকারাম মহারাষ্ট্র দেশে তাহার অপেক্ষা আরও গৌরবের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পদাবলী "অভঙ্গ" নামে পরিচিত। এই সকল অভঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় জাতির জাতীয় সম্পত্তি। ভিক্ষুক হইতে মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত ইহা

সাদরে গান ও শ্রবণ করেন। অনেক ধর্ম্মমন্দিরে ইহা "দেবী-মাহাত্ম্য" ও "গীতা"র ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক পঠিত হয়; এবং বংশাভিমানী অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শূদ্রজাতীয় এই মহাপুরুষের রচিত ভক্তিকথা কীর্ত্তন করিয়া, আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত বোধ করেন। তুকারামের চরিত অতীব বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, নিষ্ঠা, এবং ভক্তির গম্ভীরতা আলোচনা করিলে মোহিত হইতে হয়। বঙ্গীয় পাঠক, পাঠিকাদিগের নিকট সেইজন্য তাহা বিবৃত করিব।

মহারাষ্ট্র-রাজধানী পুনার আটক্রোশ পশ্চিমোত্তর অংশে ইন্দ্রায়ণী নামক একটী ক্ষুদ্র নদী বর্ত্তমান আছে। ইহার কূলে দেহু নামক গ্রাম। দেহুতে "মোরে" উপাধি-ধারী একটী প্রাচীন মারাঠা পরিবার বাস করিতেন। ইহাঁরা শূদ্র জাতীয় এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ মারাঠা পরিবারের সহিত ইহাঁ-দিগের আত্মীয়তা ছিল। এই পরিবারে আনুমানিক ১৬০৭।১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন।*

---

* তুকারামের জন্মবৎসর কোন স্থলেই স্পষ্টাক্ষরে নিরূপিত হয় নাই। মহীপতি কৃত "ভক্ত লীলামৃত" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের বিবরণ মহীপতি নামক মহারাষ্ট্রীয় কবির রচিত "ভক্তলীলামৃত" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে ভক্তিবৃক্ষ তুকারামের জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, তাহার বীজ বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হৃদয়ে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে তাহার পরিবর্দ্ধনের জন্য সেবা ও প্রেমরূপ বারি সিঞ্চন করিয়াছিলেন।" তুকারাম যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পুরুষানুক্রমে সেরূপ ভক্তিমান্

যে, তুকারাম ২১ বৎসর বয়সে নানাপ্রকার বিপদে পতিত হন্। এই সময় তাঁহার জীবনের অর্দ্ধাংশ গত হইয়াছিল। ২১ বৎসর জীবনের অর্দ্ধাংশ হইলে, ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এইরূপ স্থির করিতে হয়। তুকারাম ১৫৭২ শকাব্দে (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করেন। মহীপতির এই উল্লেখ অনুসারে ১৫২৯।৩০ শকাব্দ তাঁহার জন্মবর্ষ বলা যাইতে পারে।

তুকারামের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মহীপতিকৃত গ্রন্থাবলী সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। মহীপতি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "ভক্ত লীলামৃত," "ভক্ত বিজয়" ও "সন্ত বিজয়" নামক তিন খানি কবিতাগ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিন খানিতেই তুকারামের ও মহারাষ্ট্র দেশের অনেক সাধুপুরুষের চরিত বর্ণিত হইয়াছে।

ও বৈরাগ্য-রত পরিবার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তুকারামের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর বাণিজ্যব্যবসায় করিতেন, কিন্তু কখনও অধর্ম্মাচরণ দ্বারা ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন না। সাধু, সন্ন্যাসী ও অতিথিদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি পরম যত্নে সেবা করিতেন। সাংসারিক কার্য্যের সময়েও তিনি 'নাম-গানে' বিরত থাকিতেন না। রাত্রিকালে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, তিনি মহোল্লাসে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। পণ্ঢরপুরের বিঠোবা দেবের পূজা তাঁহাদিগের কৌলিক রীতি ছিল। পণ্ঢরপুর দেহুগ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে ভীমানদীর তীরে অবস্থিত। এত দূরবর্ত্তী হইলেও, বিশ্বম্ভর প্রতি একাদশী তিথিতে পদব্রজে তথায় গমন করিয়া, বিঠোবা দেবের পূজা ও অর্চ্চনা করিতেন। অর্থব্যয়, পথশ্রম এবং দস্যু তস্করাদির ভয় কিছুতেই তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ক্রমান্বয়ে ষোড়শ বার এইরূপ গমনাগমনের পর, একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, বিঠোবা তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "বৎস, আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি। তোমায়, আর ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক, পণ্ঢরপুরে যাইয়া আমার পূজা করিতে হইবেনা; তুমি নিজ গ্রাম দেহুতেই আমাকে

প্রাপ্ত হইবে।” বিশ্বম্ভর ইহার পর স্বপ্ন-নির্দ্দিষ্ট একটী আম্রকাননে বিঠোবার বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন, এবং দেহুর অনতিদূরে, ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তাহাতে তাহা স্থাপন করিয়া, ভক্তিভরে পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। *

---

* বিঠোবা বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। বিঠোবা নাম সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা “পণ্ঢরপুরমাহাত্ম্য” নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ডরীক নামক কোন ব্রাহ্মণকুমার যৌবনে একান্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন। দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে তিনি পিতামাতাকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করিতেন। একদা পর্ব্বোপলক্ষে পিতা, মাতা ও প্রতিবাসিগণের সঙ্গে পুণ্ডরীক কাশীধামে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা, কাশীর অনতিদূরে, কোন সাধুপুরুষের আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইয়া, সেখানে রাত্রিযাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাত্রিতে পুণ্ডরীকের নিদ্রা হইতেছিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটী রমণী, এক এক কুম্ভ জল মস্তকে লইয়া, আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রমণীগণ কিয়ৎক্ষণপরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পুণ্ডরীক দেখিলেন যে, আশ্রমের ভিতর প্রবেশের সময়ে তাঁহাদিগের দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। সেরূপ জ্যোতি মনুষ্যদেহে সম্ভব নহে। পুণ্ডরীক, তখন ভূনত হইয়া, তাঁহাদিগের পরিচয় ও রূপ পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীগণ বলিলেন, “আমরা

বিশ্বম্ভরের পত্নী অমাবাঈও স্বামীর ন্যায় ভক্তিমতী ও সেবা পরায়ণা ছিলেন। তিনিও অতি নিষ্ঠার সহিত বিঠোবার আরাধনা করিতেন। বিশ্বম্ভরের পুত্রগণ কিন্তু, পিতামাতার সাত্বিকভাব লাভ না করিয়া, রাজসিক

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এই আশ্রমস্থিত মহাপুরুষ, পিতামাতার সেবায় এরূপ নিরত যে, তাঁহার কথনও আমাদিগের জলে স্নান করিতে যাইবার অবসর হয় না। সেই জন্য আমরা নিজেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যে আমাদিগকে কৃষ্ণকায়া দেখিয়াছিলে, তাহার কারণ এই যে, দিবসে লক্ষ লক্ষ পাপীর স্নানাবগাহনে আমাদিগের দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আমরা আবার আমাদিগের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা লাভ করি। দেবীগণ এই বলিয়া, পুণ্ডরীককে পিতামাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, অন্তর্দ্ধান করিলেন। পিতৃদ্রোহী পুণ্ডরীকের হৃদয় বিগলিত হইল। পিতৃমাতৃভক্ত যদি গৃহে বসিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতীর দর্শন লাভ করিতে পারেন, তবে আর কাশীধামে গমনের আবশ্যক কি? এই ভাবিয়া পুণ্ডরীক পিতা মাতার সঙ্গে সেথান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং একান্তঃকরণে পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে নারায়ণ পুণ্ডরীকের পিতৃমাতৃভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পুণ্ডরীক পিতামাতার পদসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরে দৈবজ্যোতির আবির্ভাব দর্শনেও পুণ্ডরীক

কার্য্যেই অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে, সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে নিরত থাকিতেন। অমাবাঈ পুত্রদিগের যুদ্ধানুরাগ দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে

পিতামাতার সেবা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পার্শ্বভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পিতামাতার সেবায় নিরস্ত না হইয়া, কেবল মাত্র নিকটস্থিত একখানি ইষ্টক ভগবানকে আসীন হইবার জন্য প্রদান করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান সেই ইষ্টকের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে পুণ্ডরীক, স্বেচ্ছানুরূপ পিতৃমাতৃ সেবা করিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পুণ্ডরীক বলিলেন, "তবে আপনি যেমন দাঁড়াইয়া আছেন, সর্ব্বদা আমার সম্মুখে সেইরূপ দাঁড়াইয়া থাকুন। আমি যেন পিতা মাতার সেবা করিতে করিতে, সকল সময়ে, আপনাকে এইরূপ দেখিতে পাই।" ভগবান "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্র ভাষায় ইষ্টককে "বিট্" বলে; "বা" শব্দ গৌরব সূচক; ইহার অর্থ পিতা বা গুরুজন। "ইষ্টকোপরি বর্ত্তমান পিতা পরমেশ" এই অর্থে বিঠোবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিঠোবার অপর নাম বিঠ্ঠল বা পাণ্ডুরঙ্গ। বিঠোবার আবির্ভাব বশতঃ পণ্ঢরপুর দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হইয়াছে।

পারেন নাই। তাঁহাদিগের যুদ্ধানুরাগের পরিণাম কিরূপ হইবে, বিঠোবার আরাধনাফলে তিনি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রদিগকে বলিতেন "যে, বিঠোবার আদেশ, তোমরা যুদ্ধ-ব্যবসায় ত্যাগ কর। না করিলে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে না।" কিন্তু তাঁহার উদ্ধতপ্রকৃতি পুত্রেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না; প্রত্যুত জননীকে বায়ুরোগগ্রস্তা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "মা! আজ তোমার বিঠোবা তোমায় কি বলিলেন?" যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যে অমাবাঈয়ের পুত্রদ্বয় যুদ্ধে নিহত হইলেন এবং বিজয়ী শত্রুগণ তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। অমাবাঈয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী ছিলেন, তিনি পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন। অমাবাঈয়ের শেষ জীবন অত্যন্ত দুর্দ্দশায় অতিবাহিত হইয়াছিল। স্বামী ও পুত্রদ্বয়ের লোকান্তর গমনের পর, বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হওয়াতে, তাঁহাকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইত। কিন্তু সেই সকল বিপদের মধ্যেও তিনি কখনও বিঠোবার পূজা ও অর্চ্চনা হইতে বিরতা হন নাই; তাহাতেই তিনি শান্তি লাভ করিতেন। অমারাঈয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব

করিলেন। কুলদেবতার নামানুসারে এই বালকের নাম বিঠোবা হইয়াছিল। বিঠোবা, পিতা ও পিতৃব্যের প্রকৃতির অনুকরণ না করিয়া, পিতামহ বিশ্বম্ভরেরই অনুগামী হইয়াছিলেন। তিনিও পিতামহের ন্যায় বিঠোবার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং পর্ব্বোপলক্ষে পণ্ঢরপুরে যাইয়া বিঠোবার পূজা করিতেন। পবিত্রাত্মা বিশ্বম্ভর ও ভক্তিমতী অমাবাঈএর পুণ্যবলে তাঁহাদিগের অধস্তন পুরুষগণ সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তুকারাম বিশ্বম্ভর হইতে সপ্ত পুরুষ নিম্নবর্ত্তী। তাঁহার পিতার নাম বোহ্লোবা। বোহ্লোবায় তাঁহাদিগের বংশের সদ্‌গুণ সমূহ সুন্দররূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি একদিকে যেমন ভক্তিপরায়ণ, অপর দিকে তেমন সাধু ও সন্ন্যাসিগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান এবং তৃষার্ত্তকে বারিদান তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। ভক্তলীলামৃত-রচয়িতা মহীপতি তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "সকল জীবকেই তিনি আত্মভাবে দর্শন করিতেন। উদ্ধত ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না এবং সাংসারিক কোন কার্য্যে তিনি কখনও মিথ্যাচরণ করিতেন না।"

তুকারামের জননীর নাম কনকাঈ। কনকাঈ পতিপরায়ণা ও "ভজনামৃতপানে" অনুরক্তা ছিলেন। অনেক

বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখ সন্দর্শন না করাতে, বোহ্লোবা ও কনকাঈ অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। তাঁহারা কুলদেবতা বিঠোবার নিকট পুত্রলাভের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। অনেক বয়সে ইহাঁদিগের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। ইহাঁর নাম সাওজী। তুকারাম বোহ্লাবা ও কনকাঈয়ের দ্বিতীয় পুত্র। এইরূপ কথিত আছে যে, কনকাঈ যথন দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হন, তথন সংসারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম গান করিতে তাঁহার বাসনা হইত। তুকারাম যে একজন সাধু ও ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাঁহার জননীর এইরূপ মানসিক অবস্থায়, যেন তাহা পূর্ব্ব হইতে সূচিত হইয়াছিল। তুকারামের পরেও কনকাঈয়ের আর একটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এক দিকে পুত্র কন্যা লাভে, অপর দিকে ধন সম্পদেও এই সময়ে বোহ্লোবার ও কনকাঈয়ের সাংসারিক কামনা চরিতার্থ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ লাভ করিলে, অনেকে ভগবানের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। কিন্তু বোহ্লোবা ও কনকাঙ্গি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা সেই সর্ব্ব সুখদাতার কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদিগের গৃহে সর্ব্বদাই হরিসংকীর্ত্তন ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইত এবং তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তে ও ব্যবহার-গুণে তুকারাম বাল্যাবস্থাতেই শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিবাহ-যোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, বোহ্লোবা আপন অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত, পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিয়া ছিলেন, কিন্তু ধন, জন, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া তাঁহার "অহংভাব" পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বোহ্লোবা, তাঁহার হস্তে সংসারের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক, নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজী বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক সুখের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তিনি কিছুতেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বোহ্লোবা তখন

মধ্যম পুত্র তুকারামকেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তুকারাম,কিশোর বয়স্ক হইলেও,পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, সংসারের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র ছিল। কিন্তু তাদৃশ অল্প বয়সে সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াও তিনি তাহা বহন করিতে অকৃতকার্য্য হন নাই। তিনি অতি দক্ষতার সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কৌলিক ব্যবসায়ে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি, অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর বিশ্বাসভাজন হইয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। সকল বিষয়েই সৌভাগ্যের লক্ষণ লক্ষিত হইল।

তুকারামের দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম রুক্মাবাঈ, দ্বিতীয়ার নাম অবলাঈ। দ্বিতীয়া সাধারণতঃ জিজিবাঈ বা জিজাঈ নামে পরিচিতা। প্রথমা পত্নী কাশ-রোগগ্রস্তা ছিলেন বলিয়া, তুকারামকে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা অবলাই সাংসারিক সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। মহীপতির গ্রন্থে অবলাঈ মুখরা এবং কর্কশস্বভাবা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে প্রকৃত পতি-পরায়ণা ছিলেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সংসারের ভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তিনি, প্রকারান্তরে, স্বামীর ধর্ম্মোপার্জ্জনের সাহায্য করিয়াছিলেন। যথাস্থানে তাঁহার প্রকৃতির এবং ব্যবহারের আলোচনা লক্ষিত হইবে।

সংসারের ভার গ্রহণ করিবার পর, কয়েক বৎসর অবধি তুকারামের কোন অভাব বা ক্লেশ ছিল না। মহীপতি তাঁহার এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পিতা, মাতা, পত্নী, সুহৃদ্, ধন, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য সকল প্রার্থনীয় বস্তুতেই এই সময় তুকারামের বাসনা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এইরূপ সাংসারিক সুখ অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময়ে প্রথমে তাঁহার পিতা, তাহার পর, তাঁহার জননীও পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন, যে "তুকারামের সংসার-সমুদ্রে এত দিন সৌভাগ্যের যে জোয়ার চলিতেছিল, এইবার তাহাতে ভাঁটা আরম্ভ হইল; এবং সেই ভাঁটার প্রবল প্রবাহে সংসার-বন্ধনের সমস্ত মল প্রক্ষালিত হইয়া তুকারামের চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইল।" ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যশীলতা যদিও তুকারামদিগের বংশে পুরুষানুক্রমে বর্ত্তমান ছিল, তথাপি সম্পদ, পিতা মাতার স্নেহ, বিষয়ানুরক্তি ও সংসারের চিন্তা সম্মিলিত

হইয়া, এতদিন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে অবসর প্রদান করে নাই। যোগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, বিপদ এক্ষণে তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিল। দরিদ্রতা এবং বিপত্তি পাত্রবিশেষে হৃদয়ের উন্নত ভাব বিশুষ্ক করিয়া দেয়, সত্য; কিন্তু তাহাই আবার অমৃতবারিতে পরিণত হইয়া, হৃদয়ের সদ্ভাব পরিপোষণ করে। বাল্যকাল হইতে আদর প্রতিপালিত হওয়াতে, তুকারাম দুঃখ কাহাকে বলে, এক দিনের জন্যও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। সংসার এতদিন তাঁহার নিকট সুখময় প্রতীয়মান হইতেছিল। পিতামাতার মৃত্যুতে এইবার তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। বুদ্ধিমান, বিনয়ী ও বিষয়কার্য্যে সুচতুর ছিলেন বলিয়া, অপর ভ্রাতাগণের অপেক্ষা, তুকারামই পিতামাতার সমধিক স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং পিতামাতার মৃত্যু তাঁহারই পক্ষে অধিকতর দুঃসহ হইল। তুকারামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাওজী সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; সুতরাং গৃহস্থোচিত সমস্ত কার্য্য এবং অপর ভ্রাতা, ভগ্নীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির ভার তুকারামেরই স্কন্ধে পতিত হইল। যদিও ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স হইতেই তুকারাম সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি যতদিন

তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন, তত দিন সে ভার তাদৃশ গুরুতর বোধ হয় নাই। এক্ষণে তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি যথাসাধ্য 'ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুজনিত শোক বিস্মৃত না হইতে হইতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাওজীর পত্নী পরলোক গমন করিলেন। সাওজী স্বভাবতঃ সকল বিষয়েই উদাসীন ছিলেন; পিতা মাতার মৃত্যুতে তাঁহার ঔদাসীন্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল; এক্ষণে পত্নীর পরলোক গমনে আপনাকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত স্থির করিয়া, তিনি তীর্থ পর্য্যটনের ও ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। এই সময় তুকারামের বয়স কেবল অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র ছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সংসার লালসার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু পিতামাতার ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহত্যাগ প্রভৃতি কারণে সংসারাসক্ত তুকারামের হৃদয় ধীরে ধীরে বৈরাগ্য-মার্গে ধাবিত হইতে লাগিল। প্রলোভনের ও বিপদ্-সঙ্কুল সংসারের মধ্যে থাকিয়া, নিষ্কাম, নিস্পৃহ ভাবে ভগবানের সেবা করিবার শক্তি সুলভ নয়। সংসারের পিচ্ছিলবর্ত্মে পাছে পদস্খলন হয়,এই আশঙ্কাতেই

অনেকে সাধুজন, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিঃসঙ্গ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর সেই চির মধুর, প্রেমময়ের প্রেম একবার আস্বাদন করিলে, পৃথিবীর ধন, জন আর তাঁহাদিগকে তৃপ্তিদান করিতে পারে না। প্রমত্ত মধুপের ন্যায়, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, তাঁহারা সেই চরণারবিন্দের মধুপানে বিভোর হইয়া পড়েন। কিন্তু ভগবৎ-প্রেমে এই আত্ম-বিস্মৃতি যদৃচ্ছালভ্য নহে। রাজর্ষি জনকের ন্যায় দুই একজনই কেবল সম্পদের মধ্যেও ভগবানে আসক্ত হইয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ ভক্তই বিপদ্ হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মানবজীবনে বিপদ্ অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিপদ্ হইতে ভগবৎপ্রেম লাভ করিবার ভাগ্য সকলের নাই। সমুদ্র জলে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই মুখ যেমন কেবল ক্ষারবারিতে পূর্ণ হয়, এবং কেবল দুই একজনই যেমন রত্নলাভে সমর্থ হন; সেইরূপ সাংসারিক বিপদ্ সাগরে মগ্ন লক্ষ, লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে দুই একজন সুকৃতিমান্ পুরুষই কেবল ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া থাকেন। তুকারাম এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। পিতা মাতার ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু এবং অর্থনাশ

প্রভৃতি বিপদ্, তাঁহাকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার চিত্তকে বৈরাগ্য-বর্ত্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-প্রেমের উন্মাদক মধু আস্বাদন করিয়া, তিনি আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন। সুতরাং সাংসারিক কার্য্যে আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় আসক্তি রহিল না। কোন ভক্ত যথার্থই বলিয়াছেন ;

"মায়ের চরণ যে জন ভজে।
ও সেই চরণ অনুরাগী—হয় সে বিরাগী,
সর্ব্বত্যাগী হয় সে কাযে কাযে॥"

তুকারামেরও সেই অবস্থা ঘটিল। সেই শ্রীচরণানুরাগ তাঁহাকে বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বত্যাগী করিল। কমলা কেবল চঞ্চলা নহেন, নিতান্ত অভিমানিনী। তুকারামকে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সেবায় মনোযোগী না দেখিয়া, তিনিও ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য, ব্যবসায় চালাইতে হইলে কখনও ঋণ প্রদান, আবার কখনও বা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তুকারামকে বিষয় কার্য্যে অমনোযোগী দেখিয়া, এবং তাঁহার ধন হ্রাস হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, অন্যান্য ব্যবসায়িগণ তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় আদান প্রদানে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তুকারামের অধমর্ণগণও তাহাদিগের

দেয় পরিশোধে আলস্য করিতে লাগিল। সুতরাং দিন দিন তুকারামের অবস্থার হীনতা আরব্ধ হইল। সাংসারিক ব্যয় পূর্ব্বেরই ন্যায় চলিতেছিল, অথচ আয়ের পথ পূর্ব্বের ন্যায় উন্মুক্ত ছিল না। সুতরাং ঋণ-বৃদ্ধি অনিবার্য্য হইল। তুকারাম সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্বানুরূপ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাজনী ব্যবসায়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, তিনি অবস্থানুরূপ একটী মুদিখানার দোকান খুলিলেন। কিন্তু বণিগ্‌জনোচিত গুণেরই যখন অভাব ঘটিয়াছিল, তখন যে কোন ব্যবসায়ই হউক্, কিছুতেই উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। মহীপতি বলেন, "তুকারাম নিজের দোকানে বসিয়া অবিরত হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন; কেহ ক্রেতা আসিলে তিনি ভাবিতেন, যদি ইহাঁর মূল্যের উপযুক্ত দ্রব্য দিতে কিছু ক্রটী হয়, তবে আমার অধর্ম্ম হইবে, অতএব গ্রাহক যেরূপ চান, সেই রূপই দেওয়া উচিত।" এরূপ ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে যে ক্ষতি ঘটিবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মুদিখানার ব্যবসায়ে সুবিধা হইল না দেখিয়া, তুকারাম অপর একটী নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। তুকারাম বড়ই

পবপঁদে পড়িলেন। লোকে বলিত, ব্যবসায়ে তুকারামের মন নাই বলিয়াই তাঁহার উন্নতি হইতেছে না। তুকারাম ভাবিতেন,—"ইহার উপায় কি? আমার হৃদয় আমি এমন একজনের চরণে সমর্পণ করিয়াছি যে, সেখান হইতে তাহা উঠাইয়া লওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নয়; তবে আমার শরীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলে, যদি আমার পরিবারবর্গ সুখী হন, ও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অর্থাভাব-ক্লেশ দূরীভূত হয়, তবে আমি অবশ্যই তাহা করিব।" এই ভাবিয়া, তিনি বৃষভের পৃষ্ঠে ধান্যের ভার দিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিবারাত্রি, আহার নিদ্রা, শীত গ্রীষ্ম কিছুরই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, তুকারাম আপনার সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ করিবার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ের রীতিই যখন স্বতন্ত্র, তখন আর লাভ হইবার আশা কোথায়? দেহ ব্যবসায়ে রত, কিন্তু হৃদয় বিঠোবার চরণে অর্পিত, এ ব্যবসায়ে সুবিধা হওয়া সহজ নহে। এদিকে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার যতই অবনতি ঘটিতেছিল, বিঠোবার প্রতি তঁহার অনুরাগ সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। বিঠোবার নামেই আনন্দ, তাহাতেই পরমপ্রীতি, সাংসারিক সুখ, দুঃখ সকল ভুলিয়া তুকারাম

সেই প্রিয়তমেরই সহবাসে এবং তাহারই কথাপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তুকারামের মূলধন সমস্ত শেষ হইয়া আসিল। তিনি ঋণ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন,এবং মনের অস্থিরতা বশতঃ পূর্ব্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া পুনঃ পুনঃ নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সেই সকল ব্যবসায়েরও পরিণাম পূর্ব্বানুরূপ হইল,তুকারাম কিছুতেই আয়,ব্যয়ের সমতা করিতে পারিতেন না। গৃহে অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা ছিল, সমস্তই ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল; তুকারাম সর্ব্বস্বান্তপ্রায় হইলেন। তখন তাঁহার প্রতিবাসী বণিকেরা তাঁহার গৃহে সম্মিলিত হইয়া, হিসাব, পত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে,তুকারামের আর রক্ষার উপায় নাই। তুকারাম শেঠ দেউলিয়া হইয়াছেন, ক্রমশঃ এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহাজনেরা আসিয়া তাঁহার দ্বার অবরোধ করিয়া বসিল। ব্যবসায়ীর পক্ষে দেউলিয়া হওয়ার অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কিছুই নাই। ভক্তি ও বিশ্বাসরূপ যে দুর্ভেদ্য কবচ ভাবী জীবনে তুকারামকে সর্ব্বপ্রকার বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তখনও তাহা তুকারামের শরীর সম্পূর্ণরূপ আচ্ছাদন করে নাই। সুতরাং এই "দেউলিয়া" আখ্যায় তুকারামের

হৃদয় একবারে বিমথিত হইল। “হে ভগবন! এখন এই সংসার কিরূপে চালাইব,আমায় এ কি বিপদে ফেলিলে ?” এইরূপ বিলাপ করিয়া, তিনি, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তুকারাম বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ এই সময় তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কেহ তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিলেন, এবং কেহবা মহাজনদিগের নিকট তাঁহার প্রতিভূ হইলেন; সকলের সমবেত চেষ্টায় তুকারামের সম্ভ্রম সে যাত্রা একরূপ রক্ষা পাইল। সংসারের বন্ধুগণ, অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের সেবার বিরোধী হইয়া থাকেন। পৃথিবীর কোন অকিঞ্চিৎকর স্বার্থ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে, তাঁহারা সহজে পরামর্শ দেন না। কিন্তু যিনি ইহ পরকালের সুহৃদ্ এবং সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ কোন অবস্থাতেই যাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে অনায়াসেই পরামর্শ দান করেন। বিঠোবার প্রতি ভক্তিই তুকারামের দুরবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ; তাঁহার আত্মীয়গণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে বলিতেন; “তুকারাম! তুমি, পরমার্থপরায়ণ হইয়া, দিবারাত্রি নাম জপ কর বলিয়াই তোমার এরূপ

দুর্গতি ঘটিল। তুমি বিঠোবার ধ্যান ত্যাগ কর। বিষ্ণুভক্তি করিয়া কাহারও কখনও সাংসারিক উন্নতি হয় নাই; আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ চিরকাল একথা বলিয়া আসিতেছেন, তুমি নিজেও ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিলে। বিষয়াসক্তি ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি বা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না; তুমি একথা বুঝিতে পার না; কেবল নাম জপ করিয়াই দিনপাত কর। এ সকল তোমার ভবিষ্যৎ বিপদের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া বুঝিও। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমরা ইহা বলিতেছি। হয়ত এজন্য তোমার অসন্তোষ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কথা না শুনিয়া, যদি তুমি আবার হরিভজনে রত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।" *

তুকারাম যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়গণের পক্ষে এরূপ উপদেশ প্রদান অযোগ্য হয় নাই। বিষয়ী লোকের পক্ষে এরূপ উপদেশ দানই স্বাভাবিক। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসিগণের সৌভাগ্য যে, এরূপ উপদেশে এবং সাংসারিক দুঃখের পীড়নে তুকারামের চিত্ত বিচলিত হয় নাই। তুকারামকে বাহিরের আত্মীয়-দিগের নিকট এই উপদেশরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে

* মহীপতিকৃত "ভক্ত বিজয়" ২৭ অধ্যায়।

হইত, গৃহেও তাঁহার শান্তি ছিল না। তাঁহার পত্নী সর্ব্বদাই তাঁহাকে অনুযোগ করিতেন। বিঠোবার সেবাতেই যে এই সর্ব্বনাশ ঘটিল, তুকারামের পত্নীরও এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। তিনি বলিতেন, "গৃহের কর্ত্তা বিঠোবার সেবাতেই মগ্ন, আর আমরা অন্নাভাবে মরিতেছি; লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না।" গৃহে, বাহিরে সর্ব্বদা এইরূপ লাঞ্ছনায় ও উপদেশে তুকারাম অস্থির হইয়া পড়িলেন। সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন উচিত নয় ভাবিয়া, তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে, পুনর্ব্বার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের গৃহে চারিটী ভারবাহী বৃষ ছিল। সেই কয়েকটী বৃষ লইয়া তিনি পণ্যদ্রব্য ক্রয়, বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। দস্যু তস্করাদির ভয়ে তখন বণিকগণ দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিতেন। তুকারাম সেই সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। যে নাম তাঁহার নিকট অমৃতের ন্যায় মধুর বোধ হইত, এবং যাহা গান করিয়া তিনি স্বয়ং আত্ম-বিস্মৃত হইতেন, তাহা জগতের সকলকে বিতরণ অপেক্ষা আর কি সুখ আছে ভাবিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া লোকের কর্ণে হরিনাম প্রবেশ করাইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার সহযাত্রি-

গণের তাহা ভাল লাগিত না। তাঁহারা তুকারামের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। তুকারামকে সেই জন্য অনেক সময় একা একাই যাইতে হইত; এবং তদবস্থায় কত বার তিনি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। এক দিন এক নির্জ্জন পথে তাঁহার একটী বৃষভ ক্লান্ত হইয়া ভার সহ ভূমিতে পতিত হইল। একা তাহার পৃষ্ঠের ভার উত্তোলন করা তুকারামের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল; এবং আকাশে মেঘ, বৃষ্টির লক্ষণ সূচিত হইল। তুকারাম বিপদে পড়িয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই জনহীন স্থানে কোথা হইতে এক জন পথিক আসিয়া তাঁহার ভারোত্তোলন কার্য্যে সহায়তা করিলেন; * তুকারামও নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর, তুকারামের চারিটী

---

* পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় তুকারামেরও চরিতাখ্যায়কগণ তাঁহার জীবনে অনেক অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের আরোপ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, তুকারামের বিপদে সাহায্যের জন্য স্বয়ং বিঠোবাই পথিকের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

বৃষভের মধ্যে তিনটী পথে রোগে প্রাণত্যাগ করিল। তুকারাম বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারাই অযত্নে বৃষগুলি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া সকলেই তুকারামকে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন ;—"তোমাকেত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, বিঠোবার সেবা করিও না; তাহার ফল ত দেখিলে? তোমার চারিটী বৃষের মধ্যে তিনটীই মারা গেল। কেন আর এরূপে নিজের সর্ব্বনাশ কর? হরিশ্চন্দ্র, নল, দময়ন্তী প্রভৃতি হরিভক্ত, সত্বগুণান্বিত ব্যক্তির পরিণাম কি তুমি জান না?" কেহ বলিলেন, "তুকারাম তুমিত হরিভজন লইয়াই আছ, এদিকে তোমার পরিবারেরা যে অনাহারে মরিতেছে, তাহার উপায় কি? মহাজনদিগের নিকট যে সকল ঋণ রহিয়াছে, তাহারই বা কি করিবে? তোমার কি একটু লজ্জাভয় নাই?" দরিদ্রতা ও সাংসারিক অভাব দাম্পত্য সুখের একটী প্রধান অন্তরায়। অভাব-পীড়িত হইয়া তুকারামের পত্নীও এই সময় সর্ব্বদা কলহ করিতে ও স্বামীকে কঠোর তিরস্কার করিতে আরম্ভ করি-লেন। মহীপতি তুকারামের সেই সময়কার অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যেন একটী রাজহংসকে শ্যেনগণ আসিয়া আক্রমণ করিল। যেন কোন পীড়িত জন্তুর ক্ষত

দর্শনে বায়সগণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিবার জন্য ধাবিত হইল।" নিজের দুরবস্থার অপেক্ষা পত্নীর ও আত্মীয়গণের তিরস্কারেই তুকারাম অধিকতর মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মা ভগবানে ও দেহ সংসারে সমর্পণ করিয়া, তুকারাম এই রূপে বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। শেষ উদ্যম করিবার জন্য, তিনি, আপনার যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া, পুনর্ব্বার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কতকগুলি লঙ্কা ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থ গ্রামান্তরে গমন করিলেন। তুকারাম নূতন পণ্য দ্রব্য লইয়া, নূতন দেশে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ের রীতি সেই পূর্ব্বরূপই ছিল। তিনি কঙ্কণের সমুদ্রকূলবর্ত্তী এক দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ অশ্বত্থবৃক্ষমূলে দোকান খুলিলেন। নূতন ব্যবসায়ী দেখিয়া, দলে দলে ক্রেতা আসিতে লাগিল; তুকারামও আপনার অভ্যাসানুরূপ রীতিতে বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রেতারা মূল্য দিয়া নিজের, নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য গ্রহণ করি-

তেন, তুকারাম দ্বিরুক্তি মাত্র করিতেন না। অনেকে মূল্য না দিয়াও লঙ্কা লইয়া গেলেন; শেষ একজন আসিয়া বলিলেন; "আমার গৃহে বহু লোকের আহারের উদ্যোগ হইয়াছে, কিন্তু আমার অর্থ নাই। তুমি আমাকে তোমার বিক্রয়াবশিষ্ট লঙ্কাগুলি দাও, আমি সুবিধানুসারে তোমার মূল্য দিব। আমার প্রয়োজন আছে কিনা, যদি তোমার জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমার প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।" সরলস্বভাব তুকারাম বলিলেন, "সেকি? প্রয়োজন না হইলে কি আর তুমি আমার নিকট আসিয়াছ? আমার যত লঙ্কা আছে, তুমি লইয়া যাও।" তখন ক্রেতা বলিলেন, "আমার গৃহে রাখিবার কোন পাত্র নাই। তোমার লঙ্কা রাখিবার আধারগুলিও আমায় দাও; আমি মূল্য দিবার সময় তাহা ফিরাইয়া দিব।" তুকারাম, তৎক্ষণাৎ আধার সমেত লঙ্কাগুলি ক্রেতাকে দিলেন; এবং মূল্যের অপেক্ষা না করিয়া, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। লাভ হওয়া দূরে থাকুক্, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে মূলধনেরই অপচয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক করে না। লঙ্কা বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গৃহে আসিবার

সময় পথে তুকারাম এক প্রতারকের হস্তে পতিত হইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহাকে কতকগুলি কৃত্রিম সুবর্ণের অলঙ্কার দেখাইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাহা দ্বারা যে তুকারামের যথেষ্ট লাভ হইবে, এরূপ বুঝাইল। স্বভাবতঃ সরল প্রকৃতি তুকারাম তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ছিল না বলিয়া বলিলেন, "আমার নিকট এখন তোমার অলঙ্কারের উপযুক্ত মূল্য নাই, আমি কেমন করিয়া তোমার অলঙ্কার লইব?" প্রতারক বলিল, "আমি জানি, তুমি অতি সত্যবাদী; তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; আপাততঃ তোমার নিকট যে অর্থ আছে, তাহা আমাকে দাও; বাকী মূল্য, তোমার সুবিধামত, পরে দিলেও চলিবে।" তুকারাম, তাহার কথামত নিজের নিকট যে অর্থ ছিল, তাহা দিয়া, বিনিময়ে সেই কৃত্রিম সুবর্ণের অলঙ্কারগুলি লইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আত্মীয়গণের নিকট এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে যে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তুকারামের দ্বিতীয়া পত্নী অবলাই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। তিনি দেখিলেন

যে, স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাসও বিলুপ্ত হইয়াছে। বিষয় কার্য্যে অক্ষম ভাবিয়া কেহ আর তাঁহাকে ঋণ দিতে বা তাঁহার সঙ্গে একত্র ব্যব-

সায় করিতে স্বীকৃত হন না। কিন্তু বণিক্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যবসায় ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহেরও ত অন্য কোন উপায় নাই। এই ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, অবলাই স্বামীকে পুনর্ব্বার ব্যবসায়ে লিপ্ত হই-বার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গতি-পন্ন গৃহস্থের দুহিতা ছিলেন বলিয়া, অনেকের তাঁহার উপর বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজে মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, কোন মহাজনের নিকট হইতে দুইশত টাকা ঋণ লইলেন, এবং স্বামীর হস্তে তাহা দিয়া, তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, ব্যব-সায়ে প্রবৃত্ত করাইলেন। এই সময়ে তুকারামের গ্রামস্থ বণিকগণ ব্যবসায়ার্থ বালেঘাট নামক স্থানে গমন করিতে-ছিল। তুকারাম তাহাদিগের অনুযাত্রী হইলেন এবং ক্রয়, বিক্রয় শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবারে মূলধনের উপর তুকারামের এক চতুর্থাংশ লাভ হইল। কিন্তু হইলে কি হইবে? কর্ম্মফল তাঁহার সঙ্গেই ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া সুখভোগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা কোথায়? তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে অবজ্ঞার সহিত তাড়াইয়া দিতেন। কেহ, কেহ তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিতেন;—"এখন তোমার বিঠ্ঠলঠাকুর কোথায়? তোমার বিঠ্ঠলভক্তির পরিণাম কি হইল, তাহাত দেখিলে?" তুকারাম এ সকল কথার কি উত্তর দিবেন? নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেন। এদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং লোকে অন্নাভাবে বৃক্ষের পত্র ও কদর্য্য বন্য ফল,মূল আহার করিতে আরম্ভ করিল। তুকারামের প্রথমাপত্নী অনেক দিন হইতে কাশরোগে জীর্ণা ছিলেন, অনাহারে এবং ক্লেশে তিনি এই সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন লোকে তুকারামকে শতমুখে ধিক্কার দিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষে আরও কতজন প্রাণত্যাগ করিতেছিল, কিন্তু তুকারাম যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি লোকের নিকট তাদৃশ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। মহীপতি বলেন যে, "অস্থির উপর সঞ্জাত ক্ষতে বেদনা দিলে যেমন তাহা অধিকতর ক্লেশকর বোধ হয়, এই বিপদের সময় আত্মীয়-গণের গঞ্জনাও তুকারামের নিকট সেইরূপ মর্ম্মভেদী বোধ হইত।" লোকে যে তাঁহাকে নিন্দা করিত, তাহাতে তিনি বিচলিত হইতেন না, কিন্তু তাহারা যে তাঁহার প্রিয়তম

বিঠোবারই উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিত, তজ্জন্যই তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। যখন লোকের তিরস্কার অসহ্য হইত, তখন তিনি বলিতেন; "ভাই সব, যাহারা বিঠোবার নাম কখনও মুখে আনে না, তাহাদিগের আত্মীয়গণ কি মরিতেছে না? তবে তোমরা আমার বিঠোবা-ভজনে দোষারোপ কর কেন এবং আমার চিরশরণ সেই দয়াময় বিঠোবাকেই বা আমার দুঃখের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্থির কর কেন?" কিন্তু এই স্থলেই তুকা-রামের দুঃখের শেষ হইল না। তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোজীও প্রাণ-ত্যাগ করিল। তুকারাম সন্তোজীকে অত্যন্ত স্নেহ করি-তেন। সেইজন্য তাহার অকালমৃত্যুতে তিনি নিদারুণ বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য? কি জন্য যে তিনি তাঁহার ভক্তদিগকে কঠোর অগ্নি পরীক্ষা করেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ না করিলে যেমন সুবর্ণের নির্ম্মলত্ব সম্পাদিত হয় না, সেইরূপ কঠোর বিপদ ও দুঃখভোগ ভিন্ন বুঝি নৈষ্ঠিকী ভক্তি পরীক্ষিত হয় না। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেও সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে তুকারামের জ্ঞান তখনও পূর্ণ বিকশিত হয় নাই,

এবং তখনও তিনি সাংসারিক সুখের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে উপর্য্যুপরি এইরূপ বিপৎপাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সাংসারিক সুখ সমস্তই অলীক ও ভ্রান্তি মাত্র। অবিদ্যারূপ রজনীর অবসানের পর প্রজ্ঞাময় সূর্য্য এতদিনে তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হইল। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে, হলাগ্রে বিদীর্ণ না হইলে, বসুমতী যেমন শস্য প্রসবের উপযুক্ত হন্না, আত্মাভিমান ও লালসায় পরিপূর্ণ কঠোর মানব হৃদয়ও দুঃখে বিদারিত না হইলে তেমনই ভগবৎপ্রেম গ্রহণ করিতে পারে না। তুকারামের চরিতাখ্যায়ক মহীপতি ও সাধকের অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; "কৃষক যেমন প্রথমে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত ও বর্ষার অবিরল ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, পরে ফললাভরূপ আনন্দে আপনার পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করে; ভক্তও তেমনই, প্রথমাবস্থায় বহুক্লেশ ও বহুপরীক্ষা অতিক্রম করিয়া, পরিণামে ভগবদ্দর্শনরূপ অনুপম আনন্দে সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হন।" পত্নীর ও পুত্রের মৃত্যুতে তুকারামের সংসার-মোহ সম্পূর্ণরূপ অন্তর্হিত হইল, এবং তিনি যে এতদিন অসার সংসার-মোহে অন্ধপ্রায় ছিলেন, এই ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার এই সময়কার

মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মহীপতি লিখিয়াছেন, তুকারাম ভাবিলেন;—"হায়! সংসারে সুখলাভের জন্য কতইত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কি ফললাভ হইল? উত্তরোত্তর কেবল দুঃখই ত পাইলাম। সে কথা আর কত স্মরণ করিব? অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরে কেবল গাঢ়তর কালিমাই লক্ষিত হয়; সংসারে তেমনি যতই অধিক প্রবেশ করিবে,ততই অধিকতর দুঃখ মাত্র দেখিবে। সংসারে দুঃখ পর্ব্বত-প্রমাণ, কিন্তু সুখ স্বপ্ন-জনিত ভ্রান্তি-মাত্র। আমার আয়ুষ্কালই বা কত? তাহারও ত অধি-কাংশ সংসারের সেবায় অতিবাহিত হইল। তবে এইবার অবশিষ্টাংশ সেই রুক্মিণীনাথের ভজনেই অতিবাহিত করিব।" তুকারাম এই বলিয়া মন স্থির করিলেন। এবং এতদিন পরে জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইল ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল। সতী যেমন পতির সাক্ষাৎ-লাভ প্রত্যাশায়, সংসার, ধন, জন, পিতা, পুত্র, সকলের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া, জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন, তুকারামও, তেমনই তাঁহার প্রিয়তমের সহবাস লাভের জন্য, সংসারের সমস্ত বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক, দেহুর নিকটবর্ত্তী ভাম্বনাথ নামক একটী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নির্জ্জন প্রকৃতির সহিত সাধক-হৃদয়ের অতি মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। সংসারের কোলাহলে হৃদয় শান্তি-হীন হইলে, সাধক, প্রকৃতির নিস্তব্ধ ক্রোড়ে যাইয়া, বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করেন, এবং বহির্মুখীন দৃষ্টি রোধ করিয়া, মনশ্চক্ষুতে আপনার অন্তরাত্মাস্থিত প্রাণারাম প্রভুকে দর্শনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হন। তুকারাম, ভাম্বনাথ পর্ব্বতে গমন করিয়া, স্বীয় আরাধ্য দেব বিঠোবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রাম আরাধনা ও চিন্ত-নের পর, তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিল। এতদিন তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে যাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এইবার হৃদয়ে তাঁহার সেই হৃদয়-রাজের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া, তিনি কৃতার্থ হইলেন। বৈষ্ণব সাধকগণ মানবাত্মাকে প্রেমিকা এবং ভগবানকে প্রেমাস্পদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সংসার-সুখ-মগ্ন মানবের পক্ষে ভগবানের ও ভক্তের সম্বন্ধ বুঝাই-বার জন্য বোধ হয়, ইহার অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। প্রেমিকার নিকট প্রেমাস্পদের

ন্যায়, ভক্তের নিকট ভগবানের অপেক্ষা, সুন্দরতম আর কিছুই নাই। তাঁহার দর্শনে, স্পর্শনে, চিন্তনে যে সুখ, জগতের অপর কোন পদার্থ তাহা দিতে পারে না। প্রেমাস্পদের মুহূর্ত্তের অদর্শনে প্রেমিকের প্রাণ অধীর হয়, এবং দর্শনে হৃদয় অমৃতসিক্ত হইতে থাকে। কতক্ষণে সেই হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, প্রেমিকের মন কেবল এই চিন্তাতেই পূর্ণ থাকে। প্রেম চিরসুখের উৎস, কিন্তু নবানুরাগের অবস্থায় প্রেমিকের যে আগ্রহ ও যে সুখ হয়, অপর সময় তাহা হয় না। কি আত্ম-সমর্পণে, কি পরস্পরের নৈকট্য-স্পৃহায়, কি নবানুরাগের প্রগাঢ়তায় ভক্তের প্রেম পৃথিবীর নরনারীর প্রেমকে শতগুণে অতিক্রম করে। তুকারাম, এক্ষণে নবানুরাগজনিত সুখে মুগ্ধ হইয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা কাহারও কথা স্মরণ না করিয়া, তিনি দিবা রাত্রি সেই প্রিয়তমেরই সহবাস-সুখে অতিবাহিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তিনি যখন ভাম্বনাথে এই অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়গণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কাহ্নাইয়া, তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে ভাম্বনাথে উপস্থিত হইলেন।

অনেক অনুরোধের পর, তুকারাম, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, ইন্দ্রায়ণীতীরে আগমন করিলেন। সাত দিবস অনাহারের পর তাঁহার পানাহার সম্পন্ন হইলে, কাহ্নাইয়া তাঁহাকে আপনাদিগের সাংসারিক অবস্থা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়ে তুকারামের সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট হইলেও, তাঁহার পিতা লোককে যে সমস্ত ঋণ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ তখনও প্রাপ্য ছিল। তুকারাম বিষয়কার্য্যে ঔদাসীন্য বশতঃ সেই সমস্ত ঋণ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন নাই। কাহ্নাইয়া তাহার কথা উত্থাপন করিলে, তুকারাম তৎসম্বন্ধীয় কাগজ পত্রগুলি আনিবার জন্য ভ্রাতাকে আদেশ করিলেন; এবং কাহ্নাইয়া সেইগুলি লইয়া আসিলে তুকারাম বলিলেন;—"ভাই, যখন এই সমস্ত ঋণ আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর এগুলি রাখিয়া অনর্থক দুশ্চিন্তা বাড়াইবার ও বৃথা আশা লইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? এগুলি নদী-জলে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ।" কাহ্নাইয়া বলিলেন, "আপনি সংসারত্যাগী, আপনার পক্ষে ইহা সহজ, কিন্তু আমাকে যখন পরিবারবর্গের ভার বহন করিতে হইবে, তখন আমার পক্ষে এরূপ করিলে চলিবে কেন?" তুকা-রাম কনিষ্ঠের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, হিসাব মত

কাগজ পত্রগুলির অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন; এবং নিজের অংশের কাগজগুলি লইয়া,ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন;—"আজ হইতে তোমরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও, এই কন্থা আমার শীতাতপের সম্বল হইবে; ভিক্ষাতেই আমি জীবন ধারণ করিব।" এই বলিয়া তিনি কান্হাইয়াকে বিদায় দিলেন। কান্হাইয়া সেই সময় হইতে পৃথকরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ভাম্বনাথে নির্জ্জনবাসের পর হইতে তুকারাম চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রাতঃস্নান, দেবমন্দির-মার্জ্জন, পুণ্যাহে উপবাস এবং সেই সঙ্গে পূজা, ধ্যান ও নির্জ্জন-আরাধনা ইত্যাদিতে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য অল্পাহার আরম্ভ করিলেন এবং নিদ্রার সময় পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমিত করিয়া আনিলেন। দেহু হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাণ্ডার নামক একটী রমণীয় পর্ব্বত আছে; সমস্ত দিন সেখানে যাপন করিয়া তুকারাম, সায়াহ্নকালে আনন্দে নৃত্য ও নামগান করিতে করিতে গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেন এবং বিঠোবার মন্দিরে গমন করিয়া, অন্যান্য ভক্তদিগের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত রজনী যাপন করিতেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, নানা জনে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিত;—"ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়াতে তুকারামের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে” ; কেহ বলিত ; “না ;—তিনি যথন ইন্দ্রায়ণীতে আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন,তথন তিনি স্বার্থত্যাগী ভক্তই বটেন।” আবার অনেকে বলিত, “অন্য উপায়ে উদর পোষণের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, তুকারাম ভাক্ত সাধুর ভাব ধারণ করিয়াছেন।” তুকারাম নিন্দা, প্রশংসা কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার গন্তব্য পথ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, লোকের গঞ্জনায় তিনি ভীত হইবেন কেন ? মহীপতি বলেন যে, “দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে, যেমন তাহাতে আর রোগের আশঙ্কা থাকে না, তেমনই তুকারামের অহংভাব যথন অন্তর্হিত হইয়াছিল, তথন আর লোকের সমালোচনায় তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা কি ?” তুকারাম, আপনার ইচ্ছানুরূপ, কথনও ভাণ্ডার পর্ব্বতে, কথনও বা ইন্দ্রায়ণীতীরবর্ত্তী নির্জ্জন তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় সময়াতিপাত করিতেন। অনুকূলা প্রকৃতি তাঁহার আরাধনার সহায়তা করিত। ইন্দ্রায়ণীর কল কল নিনাদে এবং বিহগগণের মধুর কূজনে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের বাণী শ্রবণ করিতেন। দূর প্রসারিত প্রান্তরের স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভায় তিনি সেই শ্যামসুন্দর

মূর্ত্তি দর্শন করিতেন; এবং সুস্নিগ্ধ সমীরণের হিল্লোলে সেই চিরশীতলের স্পর্শ অনুভব করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তিনি ভাবে বিভোর ও আনন্দে আত্মা-হারা হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে কখন যে কি ঘটিত, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না। তুকারাম ইন্দ্রায়ণী-তীরে যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন, তাহার নিকটে কোন কৃষকের একটী শস্যক্ষেত্র ছিল। কৃষক একদিন তুকারামকে শস্য রক্ষায় নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া বলিল;—"তুকারাম! তুমিত সর্ব্বদা এখানে থাক, যদি তুমি আমার শস্যক্ষেত্র রক্ষার ভার লও, তাহা হইলে আমারও কিছু উপকার হয়, আর তোমারও পারিশ্রমিক স্বরূপ আমি তোমায় কিছু শস্য প্রদান করিতে পারি।" নিজের লাভের অপেক্ষা কৃষকের উপকার হইবে, এই ভাবিয়া, তুকারাম তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কৃষক, তখন তাঁহাকে একটী উচ্চ মঞ্চের উপর বসাইয়া ও শস্যাহারী পক্ষী-দিগকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য, তাঁহার হস্তে একটী যষ্টি প্রদান করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিল। তুকারাম ঈশ্বর-চিন্তায় এরূপ বিভোর থাকিতেন যে, পক্ষিগণ যে কখন শস্যাহার করিতে আসিত, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন

না। দেখিলেও তিনি ভাবিতেন, "ভগবানের এই সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠুরের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব? বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের সময় ইহারা পর্য্যাপ্ত আহার পায় নাই। এখন ঈশ্বর-কৃপায় যখন পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়াছে, তখন ইহারাও স্বেচ্ছানুসারে আহার করুক।" দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইলে, তিনি পক্ষীদিগকে বলিতেন, "যদি আহারে তোমাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে তোমরা যাও,জলপান করিয়া আইস।" সন্ধ্যা হইলে তিনি বলিতেন ; "অন্ধকারে তোমরা পথহারা হইবে, এখন স্ব স্ব নীড়ে প্রতিগমন কর, প্রভাত হইলে আবার আসিও।" এই বলিয়া তিনি পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দিতেন এবং তাহাদিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া ভাবিতেন ; এই সকল পক্ষী নিজের ক্ষুধানুরূপ ও দিনের প্রয়োজন মত আহার করে, পরদিনের জন্য কিছুই সংস্থান করে না ; হায়! আমার অবস্থা এমন কবে হইবে, যখন আমিও ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া, পরদিনের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব!" এদিকে তুকারামকে পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া, পক্ষিগণ, দলে দলে আসিয়া, শস্য ভোজন করিতে আরম্ভ করিল এবং অল্প দিনের

মধ্যেই ক্ষেত্রটী প্রায় শস্য-হীন করিয়া তুলিল। মহীপতি বলেন যে, "নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ স্বগৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, তুকারাম, পক্ষীদিগকে শস্য ভোজন করিতে দেখিয়া, সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করিতেন।" এদিকে ক্ষেত্রস্বামী, আপনার কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, শস্য-ক্ষেত্রের অবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও কুপিত হইলেন। তিনি প্রতিবাসিগণের নিকট তুকারামের ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য, মধ্যস্থতা করিতে বলিলেন। প্রতিবাসিগণ তুকারামকে এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, "যে সকল জীব ক্ষুধানুরূপ ভোজন করিয়াই তৃপ্ত হয়, পরদিনের কথা চিন্তা মাত্র করে না, তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া আমি প্রত্যবায়ভাগী হইব কেন? তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য।" ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রপতি তুকারামের কথায় দ্বিগুণ কুপিত হইলেন এবং তুকারামকে অতি কঠোর ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিবাসিগণের বিচারে তুকারাম অপরাধী স্থির হইলে, তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ক্ষেত্রাধিকারীর কথানুরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ শস্যের

জন্য দায়ী করিলেন। মহীপতি বলেন, "ভগবানের এমনই করুণা যে, ক্ষেত্রের শস্য সংগৃহীত হইলে তাহা ক্ষেত্রপতির প্রাপ্য শস্য অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক লক্ষিত হইল। প্রতিবাসিগণ, ইহা তুকারামেরই ভাগ্যগুণে ঘটিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া, তাঁহাকে অতিরিক্ত শস্য প্রদান করিলেন; কিন্তু নিঃস্বার্থপ্রকৃতি তুকারাম তাহা স্পর্শও করিলেন না। তুকারামের ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অনুকূলে এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, অপরের সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের শস্যক্ষেত্র হইলেও তাহার অন্যথা করিতেন না। তিনি যে ভাবে শস্যক্ষেত্র রক্ষারূপ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার অনুমোদন না করিলেও, তাঁহার ব্যবহারে যে সরলতা, নির্ভরশীলতা ও জীবের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না।

তুকারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বম্ভর দেহুতে বিঠোবার জন্য যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সংস্কার অভাবে তাহা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়াছিল। সেইটীর সংস্কার করিতে পারিলে, ভক্তগণ সেখানে হরি-পূজা ও হরিগুণানুকীর্ত্তন করিবেন, এবং তাঁহাদিগের সহবাস হইতে

নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইবে, এই-রূপ স্থির করিয়া তুকারাম সেই মন্দিরটীর জীর্ণ-সংস্কারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ কোথায়? ভিক্ষুকের ন্যায় যিনি দিনপাত করিতে-ছিলেন, মন্দির সংস্কারের ব্যয় তাঁহার কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য হইতে নিরস্ত থাকা ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সম্ভবপর নয়; তুকারাম স্বহস্তেই মন্দির সংস্কার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, এবং স্বয়ং মৃত্তিকা খনন করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সদিচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্য কখনও অসম্পূর্ণ থাকে না। তুকারামের প্রতিবাসিগণ তাঁহার দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া, আপনাদিগের শক্তি অনুসারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ মন্দির নির্ম্মা-ণোপযোগী উপকরণ সংগৃহীত হইল এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় মন্দিরটী পুনরায় সুন্দররূপ সংস্কৃত হইল। তুকারাম, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সামান্য শ্রম-জীবীর ন্যায় মন্দির সংস্কার কার্য্যে পরিশ্রম করিলেন, এবং কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, সাধারণের সাহায্যে মন্দিরটী রীতিমত প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে তুকারাম প্রতিদিন নব নব অনুরাগের সহিত বিঠোবার পূজা ও নাম

সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য ভক্তগণ, যখন অভিনব পদাবলী রচনা করিয়া, বিঠ্ঠলে গুণ কীর্ত্তন করিতেন, তুকারামেরও তখন তাঁহাদিগের ন্যায় স্বরচিত পদ বিঠোবাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ সমূহে অভিজ্ঞতা না থাকাতে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। সেই জন্য তিনি এই সময় হইতে তাঁহার পূর্ব্বতন সাধুভক্তদিগের গ্রন্থাবলী অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রাচীন ভক্তকবি * নামদেবের অভঙ্গ সমূহ পাঠ করিয়া, তিনি ভক্তিতত্ত্বের প্রথম আস্বাদন প্রাপ্ত হইলেন; এবং তাহার পর

---

* নামদেব খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় সাধুগণ কেবল নীরস বৈদান্তিক তত্ত্বেরই আলোচনা করিতেন। নামদেবই প্রথমে মহারাষ্ট্র-দেশে ভক্তি-তত্ত্বের প্রচার করেন। এইজন্য মহীপতি প্রভৃতি ভক্তচরিতাখ্যায়কগণের গ্রন্থে তিনি উদ্ধবের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। নামদেবের রচিত কোন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রণীত বহুসংখ্যক "অভঙ্গ" মহারাষ্ট্র দেশে এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে তুকারামকে নামদেবের অবতার বলেন।

কবীরের পদাবলী, জ্ঞানেশ্বর † কৃত গীতার ব্যাখ্যা এবং তৎকৃত "অমৃতানুভব" নামক অধ্যাত্মগ্রন্থ, একনাথস্বামী ‡ কৃত "ভাবার্থ রামায়ণ" ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করাতে তাঁহার হৃদয় ভক্তি-তত্ত্বের নিগূঢ়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। এই সকল গ্রন্থের ভাব ও উপদেশ হৃদয়ে সম্যক্‌রূপ ধারণা করিবার আশায়, তিনি অনেক সময় ভাণ্ডার পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি স্বভাবতঃ অতি তীক্ষ্ণ ছিল; তাহার উপর, অন্যকার্য্য বিরহিত

---

† জ্ঞানেশ্বর নামদেবের সমসাময়িক ছিলেন। নামদেব যেমন ভক্তিতত্ত্বের প্রচারক, ইনি তেমনি জ্ঞানমার্গের উপদেষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর রচিত গীতাব্যাখ্যা এক অতি বিস্তীর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। মহারাষ্ট্র দেশে তাহা জ্ঞানেশ্বরী নামে পরিচিত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের ন্যায় সমাদৃত। ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি প্রথমে কেবলই জ্ঞান মার্গের পক্ষপাতী ছিলেন, পরে নামদেবের সহবাস হইতে ভক্তিতত্ত্বের মাধুর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা করেন।

‡ একনাথ মহারাষ্ট্র দেশীয় একজন অতি প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হন, এবং জ্ঞানেশ্বর কৃত টীকার পরিভাষা রচনা করেন। তুকারামের ন্যায় ইঁহারও জীবন ভগবদ্ভক্তির ও জীবানুকম্পার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।

হইয়া, দিবারাত্রি তচ্চিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অধীত গ্রন্থ সমূহে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। যে সকল মহাপুরুষের গ্রন্থাবলী তিনি পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের জীবনের ইতিহাস ও তাঁহার হৃদয়ে অতি গভীর ভাব মুদ্রিত করিল; পুনঃ পুনঃ ধ্যান, ও মননের দ্বারা তিনি আপনাকে, তাঁহাদিগের পদাঙ্কের অনুসরণ করিবার জন্য, সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিলেন। এই সময় হইতে কবিত্বের বিকাশের সঙ্গে তাঁহার নবজীবন আরব্ধ হইল। "শেঠ" তুকারাম "ভক্ত" তুকারামে পরিণত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জীবের প্রতি প্রেম এবং ভগবানের প্রতি অনুরাগ, এই দুইটীই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। যাঁহাতে এই দুইটী গুণের সম্যক্ বিকাশ হয় না, তাঁহার ধর্ম্মজীবন অপূর্ণ থাকে। ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধও এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, একটীর সঙ্গে অপরটীর সত্তা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত ধার্ম্মিক মাত্রেরই চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মভাবের বিকাশের সঙ্গেই এই দুইটী

গুণ তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছিল। বাস্তবিকও ভগবানকে যিনি ভালবাসেন, তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমূহের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। পশু, পক্ষী, তরু, লতা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে তিনি সেই প্রিয়তমের হস্তচিহ্ন দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হন। মানব-প্রেমিক আপন প্রিয়তমের বা প্রিয়তমার লিখিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলে কত যত্নে তাহা হৃদয়ে ধারণ করেন; আর যিনি বিশ্বেশ্বরের প্রেমিক, তিনি কি তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য রূপ সপ্রেম লিপিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন? তুকারাম, দেহুতে প্রত্যাগমনের পরই, বিশ্বসেবা-ব্রতে নিয়োজিত হইলেন। যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য দশজনে সম্মিলিত হইতেন, পাছে ভক্তগণের চরণ তথায় কঠিন কঙ্করে ক্লিষ্ট হয়, এই ভয়ে তুকারাম স্বহস্তে সে স্থান মার্জ্জনা করিতেন। গ্রীষ্মকালে, সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লোকসমাগম হইলে, শ্রোতাদিগের ক্লেশ নিবারণের জন্য, তিনি স্বয়ং ব্যজন করিতেন; এবং অন্ধকারে ভক্তগণের পথ প্রদর্শনের জন্য, তিনি আলোক লইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন; কেহ ব্যঙ্গ করিলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে যখন হরিকথা শ্রবণের জন্য গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন,

তুকারাম, তখন, বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদিগের পাদুকা রক্ষা করিতেন এবং কেহ বাহিরে আসিলে, অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার পাদুকা প্রদান করিতেন। রাজ-পথে কোন ভারবাহীকে পরিশ্রান্ত ও ক্লিষ্ট দেখিলে তুকা-রাম তাহার ভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে বিশ্রামের অবসর দিতেন; এবং পথিকদিগকে মেঘদুর্দ্দিনে নিজের গৃহে বা গ্রামস্থ কোন পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণার্থ আহ্বান করিতেন। বহুদূর পর্য্যটনে ক্লান্ত ও স্ফীতপদ তীর্থযাত্রীদিগকে তুকারাম স্বগৃহে লইয়া সযত্নে উষ্ণোদকে তাঁহাদিগের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিতেন এবং তাঁহাদিগের পদের বেদনা দূর করিবার জন্য স্বহস্তে তাহা সংবাহন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, তিনি তাঁহাকে কোন দেবমন্দিরে লইয়া গিয়া তাঁহার ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীষ্মকালে পথিকদিগের জন্য বারিকুম্ভ স্কন্ধে লইয়া, যে সকল স্থানের নিকটে কূপ বা জলাশয় না থাকিত, তুকারাম সেখানে দণ্ডায়মান থাকিতেন। তাঁহার নিজের এরূপ অবস্থা ছিল না যে, ইচ্ছানুরূপ অতিথি-সেবা করিতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে তুকারাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। যে কোনরূপে হউক, তাহার জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

যে সকল পশুকে তাহাদিগের পালকগণ অকর্ম্মণ্য বোধে ত্যাগ করিত, তিনি সযত্নে তাহাদিগের সেবা করিতেন, এবং তাহাদিগের শরীরে হস্তাবর্ত্তন করিয়া ও খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিয়া, যথাসাধ্য তাহাদিগের ক্লেশ লঘু করিবার চেষ্টা করিতেন। ঘৃত, গোধূম ও শর্করা সংগ্রহ পূর্ব্বক, তিনি "ভগবানের প্রীত্যর্থ" পিপীলিকাদিগের 'গর্ত্তে প্রদান করিতেন। কোনরূপে যাহাতে ভগবানের সৃষ্ট কোন প্রাণীর অভাব বা ক্লেশ না হয়, তুকারাম সর্ব্বতোভাবে তৎসম্বন্ধে মনোযোগী থাকিতেন। শাকুনিকগণ কোন পক্ষীকে ধৃত করিয়াছে দেখিলে, তিনি অনুনয়,বিনয় দ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন। মহীপতি বলেন যে, অনবধানতা বশতঃ, কোন প্রাণীকে পদদলিত বা নিহত করিলে,তুকারাম বারিহীন মীনের ন্যায় মর্ম্মান্তিক যাতনায় অস্থির হইতেন। পরিচিত হউক বা অপরিচিত হউক, লোকের পরিচর্য্যা করিতে পারিলে তুকারাম পরম সুখ বোধ করিতেন; * এবং উপযাচক হইয়া অনেক

* শ্রীচৈতন্যেরও ধর্ম্মজীবনবিকাশ কালে এইরূপ সাধুসেবার প্রতি অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন;—

"নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেনও আপনে॥
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে।
ঝারি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥" ইত্যাদি

সময় লোকের কার্য্য করিতে যাইতেন। একবার তুকারাম দেখিলেন যে, একটী প্রাচীনা রমণী তৈল আনয়নের জন্য যষ্টির উপর ভর দিয়া অতিকষ্টে গমন করিতেছেন। তিনি দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন ;—"মা, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখিতেছি, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি তোমায় বাজারে লইয়া যাইতেছি।" বৃদ্ধা তুকারামের কথা শুনিয়া সস্নেহবাক্যে বলিলেন, "বাপু, তোমায় আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে না ; তুমি যদি দয়া করিয়া আমার তৈলটুকু আনিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই।" তুকারাম তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার তৈলপাত্র লইয়া ধাবিত হইলেন, এবং তাঁহার আদেশানুরূপ তৈল আনিয়া দিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে বৃদ্ধা, তুকারামের সহৃদয়তার প্রশংসা করিয়া, প্রতিবাসিগণের নিকট বলিলেন যে, তুকারাম যে তৈল আনিয়াছিলেন, অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারেও তাহা নিঃশেষ হয় নাই। এই কথা প্রচার হইলে সকলেই তুকারামকে তৈল আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অমায়িক প্রকৃতি তুকারাম কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না ; সুতরাং প্রতিবাসিগণের তৈল আনিয়া দেওয়া তাঁহার একটী নিত্যকার্য্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়া-

ইল। তুকারাম যে প্রদত্ত মূল্যের একটী কপর্দ্দকও আত্ম-সাৎ করেন না, এ কথা সকলেই জানিতেন; সুতরাং বিনামূল্যে এরূপ ধর্ম্মভীরু ভৃত্য পাইয়া সকলেই তাঁহার উপর দুই একটী আদেশ চালাইতে অগ্রসর হইতেন। তুকারামও যতদূর সম্ভব, তাহা পালন করিতে ত্রুটী করিতেন না। দিবসে লোকের এইরূপ পরিচর্য্যায় তাঁহার শরীর অবসন্ন হইত; কিন্তু রাত্রিতে বিঠোবার মন্দিরে গমন করিয়া, শিশু যেমন মাতাকে দর্শন করিলে সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হয়, তিনিও তেমনি সেই "শ্যামসুন্দর" মূর্ত্তি দর্শনে দিবসের সমস্ত পরিশ্রম অপনোদন করিতেন। তুকারাম, নিরীহপ্রকৃতি ও আত্মাভিমান শূন্য ছিলেন বলিয়া, প্রতিবাসিগণের আদেশ পালন করিতে অপমান বোধ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার পত্নী অবলাঈয়ের তাহা সহ্য হইত না। তিনি দেখিতেন যে, যাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবলকায়, তাহারাও, তাঁহার স্বামিকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া, ভারবাহী বৃষভের ন্যায় পরিশ্রম করাইয়া লইতেছে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করা অবলাঈয়ের পক্ষে অসঙ্গত ছিলনা। অবলাঈ এজন্য প্রতিবাসিগণের সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ করিতেন, এবং তুকারামকেও গঞ্জনা দিতেন। যাহা হউক, এইরূপে পরোপকার ও কৃচ্ছ্র সাধন

দ্বারা তুকারামের ধর্ম্মজীবন সংগঠিত হইল এবং যে কার্য্য দ্বারা তিনি মহারাষ্ট্র দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পাদনের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

তুকারামের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে যে সকল সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নামদেবের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নামদেবের রচিত অভঙ্গ হইতে তুকারাম তাঁহার ধর্ম্মজীবন বিকাশের পক্ষে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে, পণ্ঢরপুরে বিঠোবার দর্শনে গমন করিবার সময়ে, তিনি পথে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেন। একবার তিনি পথে যাইবার সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে, বিঠোবা, নামদেবকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "তুকারাম, আমার ভক্ত নামদেব পূর্ব্বে যত অভঙ্গ রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হয় নাই; অপূর্ণ সংখ্যা তুমি পূরণ কর; আমি তোমায় "সপ্রেম জ্ঞান" প্রদান করিতেছি, তুমি আমার "প্রসাদ-বাণী" প্রচার করিয়া জীবের উদ্ধার সাধন কর।" বিঠোবা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, তুকারা-মের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পৃথিবীর নানাদেশের ভক্তগণের সম্বন্ধেই ভগবানের এইরূপ আদেশের বিষয় শ্রুত হওয়া

গিয়া থাকে। ভক্তের শক্তি যে ঐশীশক্তিরই প্রতিরূপ, এই বিশ্বাসই, বোধ হয়, এইরূপ সর্ব্বদেশব্যাপী প্রবাদের কারণ। ভগবদ্দত্ত শক্তি ব্যতীত যখন পৃথিবীর একটী ক্ষুদ্র কার্য্যও সম্পন্ন হয় না, তখন স্বয়ং শ্রীভগবানের মহিমা যিনি প্রচার করিতে সক্ষম হন, সেই শক্তিমান পুরুষ যে তাঁহার বিশেষ কৃপার অধিকারী, জনসাধারণের এরূপ বিশ্বাস হওয়া অসঙ্গত নহে। যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তিনি মনে করেন, আমি যাহা করিতেছি, তাহা আমার প্রভুই আমার দ্বারা করিতেছেন, তাঁহার এইরূপ সংস্কার জন্মে যে, আমার জাগ্রত অবস্থার প্রত্যেক চিন্তা যখন তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, তখন সুষুপ্তি কালের চিন্তাই বা অন্যপ্রেরিত হইবে কেন? সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা তুকারাম ভগবদ্বিধান বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বগামী মহাপুরুষদিগের রচনাবলী সর্ব্বদা পাঠ করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে ভক্তিভাব পূর্ব্বে উদ্ভূত হইয়াছিল, এক্ষণে শ্রীভগবানের মহিমাব্যঞ্জক পদ রচনা করিয়া তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার স্বভাবতঃ বাসনা জন্মিল। তুকারাম প্রথমে ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নয় শত শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, একখানি গ্রন্থ

রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে অন্যের রচিত পদাবলী গান করিতে করিতে ভাবাবেশে তাঁহার মুখ হইতে অনেক পদ স্বতঃ বহির্গত হইতে লাগিল। মহীপতি বলেন যে, তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায়, তুকারামের মুখ হইতে যখন সরস ভাবময়ী কবিতাবলী অবিচ্ছেদে নিঃসৃত হইত, তখন শ্রোতারা, সেই সকল প্রসাদগুণময়ী, অপূর্ব্ব চিন্তিত, নূতন কবিতা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে তাহা ঐশীশক্তিসম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তুকারামের নিজের জীবন তাঁহার কবিতারই ন্যায় সরস, পবিত্র ও কৃত্রিমতাশূন্য ছিল বলিয়া, শ্রোতাদিগের হৃদয়ে তাহা গভীর ভাব মুদ্রিত করিত। কুটিল প্রকৃতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষ্টা ব্যক্তিগণও তুকারামের উপদেশপূর্ণ পদাবলী শ্রবণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইত। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের এমনই এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে একবার তাহা শ্রবণ করিত, সে আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারিত না। যে দিন তিনি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, অন্যদিনের অপেক্ষা সে দিন সঙ্কীর্ত্তন স্থলে শ্রোতার সংখ্যা অনেক অধিক হইত। দেহুর অধিবাসিগণ ও দূরবর্ত্তী গ্রামস্থ অনেকেও, ক্রমশঃ তুকারামের সঙ্কীর্ত্তনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া, বিঠোবার মন্দিরে আগমন

করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে তুকারামকে উন্মত্ত ভাবিয়া লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন, তুকারামের ভাব দেখিয়া এখন তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ক্রমশঃ তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তিনি যে একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, অনেকেরই এইরূপ ধারণা জন্মিল। লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে কাহারও কাহারও হৃদয়ে আত্মাভিমান সম্ভূত হয়; কিন্তু আত্মাভিমানী হওয়া দূরে থাকুক, তুকারাম বরং, নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া, আরও বিনীত ও কোমল হইতে লাগিলেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মনের ভাবও পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে তিনি সংসার হইতে পলায়ন করিয়া, জনমানবহীন স্থানেই তপশ্চর্য্যা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; এক্ষণে সংসারে থাকিলে তিনি নানা বিষয়ে জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন ভাবিয়া, সংসারের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের বিরাগ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের পক্ষপাতী হইলেন বলিয়া, তিনি যে আবার পূর্ণমাত্রায় সংসারী হইবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। বিষয়কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনেক দিন পূর্ব্বেই তুকারামের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সুতরাং সংসা-

য়ের ভার পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাঁহার পত্নী অবলাঈয়ের উপর অর্পিত রহিল। মহীপতি যেখানেই অবলাঈয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাকে কলহকারিণী, কর্কশা বা কঠিনা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। তিনি যে ভাবে অবলাঈয়ের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে সক্রেটিসের সঙ্গে জাণ্টিপীর ন্যায় তুকারামের সঙ্গে অবলাঈয়ের সম্মিলনও বিধাতার বিড়ম্বনা বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অবলাঈ যে নিন্দনীয়া ছিলেন, তাহা আমাদিগের বোধ হয়না। সাধুপুরুষদিগের পত্নীগণের এই একটী দুর্ভাগ্য যে, লোকে তাঁহাদিগের দোষ,গুণ বিচার করিবার সময়ে তাঁহা-দিগকে তাঁহাদিগের স্বামীগণের সহিত তুলনাতেই বিচার করিয়া থাকেন; সাধারণ মহিলাগণের সহিত তুলনায় বিচার করেন না। সাধারণ রমণী হইয়া,মহাপুরুষ স্বামিরূপ মান-দণ্ডে পরিমাপিত হওয়াতে তাঁহারা যে অতি ক্ষুদ্র ও অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে, তাঁহাদিগের অপরাধ তাদৃশ গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। অবলাঈয়ের সম্বন্ধে মহীপতি যে সকল অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন, তাহার বিচার করিবার জন্য, আমরা অবলাঈয়ের চরিত্র একটু আলোচনা

করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। অবলাঈ, সম্পন্ন গৃহস্থের দুহিতা হইয়া, সম্পন্ন গৃহস্থের বধূ হইয়াছিলেন। বিবাহের পর শ্বশুরের ও শ্বশ্রূর নিকট তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী রূপে তিনি স্বামির অনুরাগও যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর শ্বশুরালয়ে তিনি সম্পন্ন গৃহস্থোচিত স্বচ্ছন্দে অভ্যস্তা হইয়াছিলেন। তাহার পর ঘোরতর অর্থাভাব, এমন কি, সময়ে সময়ে, উপবাস পর্য্যন্ত ঘটিতে লাগিল। এ অবস্থায় একটু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ বিচিত্র নয়। দুঃখ অপ্রতিহার্য্য বুঝিতে পারিলেও তাদৃশ ক্ষোভ হয় না। কিন্তু অবলাঈ জানিতেন যে, তাঁহাদিগের ক্লেশ সম্পূর্ণরূপেই তুকারামের ত্রুটীর ফল। এরূপ অবস্থায় দম্পতীর মধ্যে কলহ অবশ্যম্ভাবী। তাহার উপর স্বামী, যদি, সাংসারিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, দিবারাত্রি কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়াই থাকেন, আর পত্নীকে অন্নচিন্তা লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে কয়জন স্ত্রীলোকের স্বভাব কোমল থাকে, বলিতে পারি না। সুতরাং অবলাঈয়ের রুক্ষ স্বভাবের জন্য আমরা তাঁহার নিন্দা করি না। তুকারাম "হরি কথা" লইয়া থাকিতেন, আর অবলাঈকে সন্তান-প্রতিপালন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি সাংসারিক সমস্ত ভার

বহন করিতে হইত। তাহার উপর সময়ে সময়ে তুকারাম যেরূপ অত্যুদার ব্যবহার করিতেন, তাহাতে অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই ধৈর্য্য রক্ষা হইতে পারে। অবলাঙ্গী হয়ত আপনার লজ্জানিবারক একমাত্র বস্ত্র বা কাঁচুলটি রাখিয়া স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, তুকারাম সেই সময়ে তাহা কোন দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যক্তিকে দিয়া বসিয়া আছেন ; এ অবস্থায় ঋষিজনোচিত সহিষ্ণুতা না থাকিলে আর পারিবারিক শান্তি থাকিতে পারেনা। মধ্যাহ্নকালে হয় ত অবলাঙ্গী কায়ক্লেশে আপনাদিগের ক্ষুদ্র পরিবারের প্রাণধারণের যোগ্য আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তুকারাম সেই সময়ে ৪।৫টী অতিথি সঙ্গে লইয়া গৃহে উপস্থিত হই-লেন। কাজেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অবলাঙ্গীকে যেরূপে হউক, তাহাদিগের খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইত। ইহার উপর লোকে তুকারামকে যেরূপ নির্ব্বোধ বলিয়া চিত্রিত করিত, তাহা যে কোন পতিব্রতার পক্ষেই ক্লেশকর। সকল থাকিয়াও তুকারাম যে একটু সাংসারিক বুদ্ধির অভাবে লোকের নিকট নির্ব্বোধ, বাতুব বা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান রহিত বলিয়া অভিহিত হইতেন, অবলাঙ্গী তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। সংসারসর্ব্বস্ব বিজ্ঞগণ আবার অবলাঙ্গীকে বুঝাইতেন যে, বিঠোবার সেবা করিয়া, বলি,

প্রহ্লাদ প্রভৃতি কাহারও কোন কালে সুখ হয় নাই; তুকারাম সেই বিঠোবাকেই যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কল্যাণের আশা কোথায়? অবলাঈ পিতৃ-গৃহে ভবানীর পূজায় অভ্যস্তা হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্বশুরা-লয়ে বিঠোবার সেবা তাঁহার পক্ষে নূতন ছিল এবং সেইজন্য তাহাতে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। বিঠোবা-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, অবলাঈ স্বামীর ধর্ম্মবিশ্বাসে তাদৃশ সহানুভূতি করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে অনেক সময়ে দম্পতীর মধ্যে কলহ ও মনোবাদ ঘটিত। অবলাঈ যখন আরম্ভ করিতেন, তখন একবারে প্রহরস্থায়ী অগ্নিবৃষ্টি না করিয়া ছাড়িতেন না। নিরীহ-প্রকৃতি তুকারাম, এরূপ যুদ্ধে পলায়নই একমাত্র রক্ষার উপায় ভাবিয়া, গৃহ হইতে অদৃশ্য হইতেন; এবং অবলাঈয়ের কোপ শান্ত হইলে পরে গৃহে ফিরিতেন। অবলাঈ মুখরা হইলেও তাঁহার একটী মহৎ গুণ ছিল, তিনি প্রকৃত পতিপরায়ণা ছিলেন। স্বামীর আহার না হইলে অবলাঈ কখনও নিজে আহার করিতেন না। এই জন্য তুকারাম গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলে অবলাঈকে উপবাস করিতে হইত, এবং নদীতীরে, প্রান্তরে, পর্ব্বতগুহায়, যেখান হইতেই হউক, তুকারামকে অন্বেষণ করিয়া আহার না

করাইয়া অবলাঙ্গী কিছুতেই নিরস্ত থাকিতেন না। তুকা-
রাম ভাম্বনাথ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবলাঙ্গী আহার্য্য
দ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতেন। একদিন এই-
রূপ অবস্থায় রৌদ্রে তপ্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইবার পর
চরণে কণ্টক বিদ্ধ হওয়াতে অবলাঙ্গী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ি-
য়াছিলেন। তুকারাম তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া সেই হইতে
দেহুতেই থাকিতেন। মহীপতি অবলাঙ্গীকে কটুভাষিণী ও
কলহকারিণী বলিয়া নিন্দা করিলেও, তিনি যে সাধ্যানু-
সারে সাংসারিক কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ক্রটী করিতেন না,
তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং অবলাঙ্গী
প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিতে না পারি-
লেও, নিজের স্কন্ধে সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া, স্বামীকে
অর্থচিন্তারূপ উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান পূর্ব্বক, পরোক্ষ-
ভাবে যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে
সন্দেহ নাই। যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তির সহিত
তিনি স্বামীর সেবা ও পরিচর্য্যা করিতেন, তাহা যে
কোন রমণীর পক্ষেই প্রশংসনীয়। নিরপেক্ষভাবে তাঁহার
ব্যবহার চিন্তা করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে মহীপতির
কটূক্তির অযোগ্যা বলিতে বাধ্য হই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তুকারাম যে ক্রমশঃ একজন প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত সাধু পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা, ভগবন্নিষ্ঠা, জীবানুকম্পা প্রভৃতি গুণের জন্য এবং তাঁহার প্রদত্ত মধুর ধর্ম্মোপদেশের জন্য অনেকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশীয় কোন কোন ব্যক্তিও তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশ শ্রবণে কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে গঙ্গাধর পন্ত নামক একজন ব্রাহ্মণ ও সন্তাজী নামক একজন তৈলিক, এই দুই জনই প্রধান। তুকারামের সংকীর্ত্তন ও কথকতার সময়ে, ইঁহারা করতাল ও বীণা হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্রুবা (ধুয়া) ধরিতেন। গঙ্গাধর পন্তের উপর তুকারামের কবিতা লিখিবার ভার ছিল। কিন্তু সাধারণের নিকট এইরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে তৎকালের ভক্ত সাধুগণের নিকট

তুকারামের প্রশংসা অসহনীয় হইল। তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধনে তাঁহাদিগের নিজের প্রতিপত্তি হ্রাস হইবার আশঙ্কায়, তাঁহারা তুকারামের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "মম্বাজী বাবা গোঁসাই" নামক একজন "সাধু" সর্ব্বপ্রথমে তুকারামের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইনি দেহু গ্রামে এক মঠ সংস্থাপন করিয়া সেখানকার "মোহান্ত" হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে "মম্বাজী বাবা মহাপুরুষ" বলিত। কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণ লোক তাঁহার অপেক্ষা তুকারামের প্রতি সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায়, মম্বাজী তুকারামকে অপমানিত করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। তুকারাম বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে, অবলাঈয়ের পিতা আপ্পাজী কন্যা ও জামাতার প্রতি স্নেহবশতঃ, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে আপ্পাজী তুকারামকে একটী মহিষ প্রদান করিয়াছিলেন। বিঠোবার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মম্বাজীর এক উদ্যান ছিল। দৈবক্রমে একদিন তুকারামের মহিষ, সেই উদ্যানের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক, কতিপয় পুষ্পবৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিল। তদ্দর্শনে মম্বাজী ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তুকারামের উদ্দেশে অজস্র কটূক্তি

বর্ষণ করিলেন। কিন্তু তুকারাম নিকটে না থাকায়, সেদিন আর অধিক কিছু করিবার সুবিধা পাইলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটনায় তুকারাম মম্বাজীর কোপে পতিত হইলেন। একদা সায়ংকালে, একাদশী উপলক্ষে, দেহুতে বিঠোবার দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মম্বাজী স্বীয় উদ্যানটীকে কণ্টক-বৃতিতে এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা দেব-দর্শনার্থিগণের প্রদক্ষিণ-স্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছিল। অন্ধকারে নবাগত দর্শনার্থিগণের পদে কণ্টক-বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায়, তুকারাম স্বহস্তে সেগুলি উৎ-পাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। মম্বাজী পূর্ব্বাবধি অবসর খুঁজিতেছিলেন; এক্ষণে তুকারামকে তাঁহার উদ্যানের কণ্টক-বেষ্টন উৎপাটিত ও ভগ্ন করিতে দেখিয়া, একবারে ক্রোধে অন্ধ প্রায় হইলেন। তিনি কটু ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে তুকারামের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারই উৎপাটিত কণ্টক-যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। একটীর পর একটী করিয়া ১০।১৫টী কণ্টক-যষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে, মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। তুকারাম অকাতরে ও

নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিলেন। মম্বাজীর প্রহারকালে তিনি কেবল মনে মনে নাম জপ করিতেছিলেন। গোঁসাইজী প্রহার কার্য্য সমাধা করিয়া, মঠে প্রতিগমন করিলে, তুকারাম, মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক, বিঠোবার নিকট সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিলেন। তুকারামের এই রূপ দুর্গতি দর্শনে অনেকেরই নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্তু "মোহান্ত" মম্বাজী বাবার অভিসম্পাত-ভয়ে কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তুকারামের জীবনের অনেক ঘটনা তিনি তাঁহার রচিত অভঙ্গ সমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল অভঙ্গ তাঁহার স্বলিখিত জীবন-চরিত। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিবরণ, তাঁহার পারিবারিক অবস্থা, তাঁহার নির্ভরশীলতা প্রভৃতি অনেক বিষয় সেই সকল অভঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই ঘটনারও উল্লেখ করিয়া, তুকারাম ছয়টী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটীর মর্ম্ম মহীপতি এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ;—"হে ভগবন্ ! বুঝিয়াছি, দুর্জ্জনের সান্নিধ্যে কিরূপে সাধুগণের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইয়া অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই তুমি আমাকে এই শিক্ষা প্রদান করিলে। এইবার হইতে দুর্জ্জনের সংসর্গ হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিবার চেষ্টা

করিব।" এই ঘটনায় রচিত অভঙ্গ সমুহের মধ্যে একটীর অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

ত্যজিবনা তব শ্রীচরণ।
হে বিঠোবা, তব শ্রীচরণ॥
আসুক যাতনা ঘোর ; দহুক হৃদয় মোর ;
ঘটে যদি ঘটুক মরণ ;
ত্যজিব না তবু ও চরণ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে এই দেহ শতধা করুক্ কেহ ;
তবু শঙ্কা নাহি কদাচন।
তুকা বলে ভগবান, হয়ে আছি সাবধান,
আদি হ'তে দৃঢ় করি মন॥

ভগবদ্বিধানের উপর তুকারামের যে কিরূপ নির্ভরশীলতা ছিল এবং ভাগবানকে যে তিনি কিরূপ আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় বিবেচনা করিতেন, তাঁহার নিকট এইরূপ আত্ম-নিবেদনে তাহা ব্যক্ত হইবে। কঠোর নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা তিনি যে এতদিন তাঁহার শরীর ও মনকে বশীভূত করিয়াছিলেন, শত্রুকৃত নির্য্যাতন অম্লানমুখে সহ্য করাতে, এইবার তাহার পরীক্ষা হইল। তিনি গৃহে প্রতিগমন করিলে, অবলাই তাঁহার অঙ্গবেদনা দূর করিবার জন্য শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং তুকারাম

কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ হইলে, তিনি স্বামীর সংকীর্ত্তনের ও একাদশী-নিমিত্ত হরিবাসরের আয়োজন করিয়া দিলেন। তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই যথারীতি আগমন করিলেন। মম্বাজী বাবা, তুকারামের প্রতি মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট থাকিলেও, লোক লজ্জার জন্য, অন্যান্য দিন তাঁহার সংকীর্ত্তন-স্থলে আগমন করিতেন; কিন্তু লজ্জা বশতঃ সে দিন আর উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম, তাঁহার জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। উত্তরে মম্বাজী বলিয়া পাঠাইলেন যে,"অদ্য আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হইতেছে; আমি সংকীর্ত্তনে যাইতে পারিব না।"ইহা শুনিয়া তুকারাম, স্বয়ং তাঁহার মঠে গমন পূর্ব্বক, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন; "স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্ঠি প্রহার করাতে প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে'; আমি যদি আপনার উদ্যানের কণ্টকবৃতি উৎপাটন না করিতাম, তাহা হইলে আপনার রোষোৎপত্তি হইত না; সুতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভো, নিজ গুণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়া, কৃপা পুরঃসর সংকীর্ত্তন স্থলে আগমন করুন।" এই বলিয়া মম্বাজীর বেদনা উপশমের জন্য তুকারাম স্বহস্তে

তাঁহার অঙ্গসংমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের এইরূপ ব্যবহারে মম্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইলেন। তুকারাম, তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তদিগকে লইয়া, সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে যাপন করিলেন। এইরূপ তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিলেন। সেই দিবস হইতে মম্বাজী বাবা তুকারামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, যে দিন এই সকল ঘটনা ঘটে, সেই দিন রাত্রিতে কয়েক জন তস্কর তুকারামের মহিষটী অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু কোন অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনে ভীত হইয়া তাহারা মহিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সংকীর্ত্তন-স্থলে আসিয়া তুকারামের শরণাপন্ন হয়। তুকারাম তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বলেন; "তোমাদের যদি মহিষের আবশ্যক থাকে, আমার মহিষটী লইয়া যাইতে পার; কিন্তু এরূপ পাপকার্য্য আর কখনও করিও না। তস্করগণ মহিষপ্রার্থী না হইয়া তুকারামের গুণ গান করিতে করিতে সগৃহে গমন করিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তুকারামের অসাধারণ মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, মম্বাজী তাঁহার প্রতি বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।
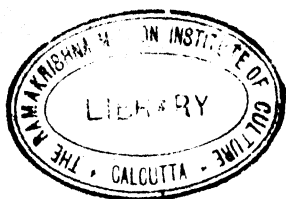
সপ্তম অধ্যায়।

হিন্দুজাতির সাধারণ বিশ্বাস যে, যিনি যতই ভক্তি-মান পুরুষ হউন, দীক্ষা না হইলে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। এই প্রচলিত বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়া, আমাদিগের কথক ও গায়কগণ বর্ণন করেন যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আজন্মতপস্বী ধ্রুবও, প্রথমে মহর্ষি নারদের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া,পরে,ভগবানের প্রসাদ-লাভের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। কঠোর আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে তুকারাম এক্ষণে দীক্ষা-লাভের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দীক্ষা সাধারণ মনুষ্য দিগের দীক্ষার ন্যায় হয় নাই। তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, বিঠোবা, তুকারামকে দীক্ষাযোগ্য দেখিয়া, স্বয়ং স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মহীপতি লিখিয়াছেন যে, একদা মাঘের শুক্ল দশমী বৃহস্পতিবার, পাণ্ডুরঙ্গের (বিঠোবার) মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া নিদ্রিত হইবার পর, তুকারাম স্বপ্ন দেখিলেন যে, যেন তিনি ইন্দ্রায়নী হইতে স্নান করিয়া

বিঠোবার মন্দিরে গমন করিতেছেন, সেই সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তুকারাম আপনার অভ্যাসানুযায়ী ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, তিনি, তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, তাঁহাকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং আপনার পরিচয় বা গুরু-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভক্ত বৈষ্ণব রাঘব-চৈতন্যের শিষ্য কেশব-চৈতন্য, আমি তাঁহার শিষ্য, আমার নাম বাবাজী চৈতন্য ;" এবং তাহার পর বলিলেন, "তুকারাম, তুমি কিছুতেই পাণ্ডুরঙ্গের উপাসনা ও ধ্যান পরিত্যাগ করিও না।" তুকারাম পরম প্রীত মনে বলিলেন ; "আপনি আমার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন্।', ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়া তুকারামের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ; কিন্তু অবলাঈ অতিথিকে দেখিয়া তুকারামের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ সেই অবসরে অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই সময় তুকারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং স্বপ্নদৃষ্ট মহা পুরুষের অদর্শনে তিনি একান্ত ব্যাকুল হইলেন। দিবসের চিন্তা অনেক সময় স্বপ্নাকারে প্রতিভাত হয়। অতিথি, অভ্যাগতের সেবা লইয়া তুকারামের সহিত অবলাঈএর সর্ব্বদা কলহ হইত এবং তজ্জন্য তুকারাম বড়ই মনে

কষ্ট পাইতেন। ব্রাহ্মণের অদর্শনে তুকারাম ভাবিলেন, সংসারে থাকাতে আমার স্বপ্নেও শান্তি ঘটিতেছে না। অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্যই সংসারধর্ম্ম, কিন্তু স্বপ্নেও যখন আমার সেই সেবাধর্ম্ম প্রতিপালনের শক্তি নাই, তখন এ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি "বল্লালের বন" নামক একটী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যূষে সেখান হইতে আসিয়া, তুকারাম ইন্দ্রায়নীতে স্নানানন্তর, বিঠোবার পূজা করিয়া পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রতিগমন করিতেন। এক্ষণে তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ বলিয়া লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য আহার্য্য দ্রব্য লইয়া বল্লালের বনে যাইতেন। যে দিন কিছু উপস্থিত না হইত, সে দিন উপবাস করিতেন। প্রায় দুই মাস কাল এইরূপ অরণ্য বাসের পর, একদিন তুকারাম ইন্দ্রায়নীতে স্নানার্থ আগমন করিয়াছেন, অবলাঈও সেই সময় জল আনয়নের জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। তুকারামকে দেখিয়া অবলাঈ তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন ;—"তুমি আজ দুই মাস আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ; আমাদিগের উপায় কি হইতেছে, তাহা কি তোমার মনে হয় না?" তুকারাম বলিলেন, "বিঠোবা ও রুক্মিণী জগতের পিতামাতা,

আমরা সকলেই তাঁহাদিগের সন্তান; তুমি তাঁহাদিগের শরণাপন্না হও, তোমার অভাব থাকিবে না।” অবলাঈ অনেক অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “আমি আর তোমার ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাঘাত করিব না; তুমি গৃহে চল, সেখানে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিবে।” তুকা-রাম স্বীকৃত হওয়াতে পতি পত্নীর পুনর্ম্মিলন হইল, এবং তুকারাম স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, আপনার অঙ্গন-স্থিত তুলসীমঞ্চের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক হরিভজন আরম্ভ করিলেন এবং অবলাঈয়ের শিক্ষার জন্য তাঁহাকেও পার্শ্বে বসাইয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের কথকতা ও সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার সময় হইতে তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই লোকসমাগম হইত; অবলাঈ তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তুকারাম পত্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন, “দেখ, বিঠোবার সেবা করাতে সমস্ত বিশ্বই এক্ষণে আমাদের আত্মীয় হইয়াছে। নিজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কে কোথায় কাহার গৃহে গমন করে? ইহারা যে সকল কার্য্য ছাড়িয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি কোথায় তাহাতে গৌরবান্বিতা হইবে, না বিরক্ত হও; ইহাত কর্ত্তব্য নয়। পুত্র, কন্যাদির জন্য তোমার এত চিন্তা

কেন? বিঠোবা জগতের প্রতিপালক, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখিলে তোমার কোন অভাবই থাকিবে না। যতদিন সংসারের প্রতি তোমার মমতা থাকিবে, ততদিন তোমার হরিসাধন হইবে না। আগামী কল্য অতি শুভদিন; চিত্তকে দৃঢ় করিয়া ও বিনশ্বর পদার্থের প্রতি মায়া ত্যাগ করিয়া, সংসারের যাহা কিছু আছে দেব, দ্বিজাদির সেবায় নিযুক্ত কর, এবং বৈষ্ণবের দাসী হইয়া অনন্যচিত্তে সাধুগণের শরণাপন্না হও। ক্ষণস্থায়ী সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া, যদি বিঠ্ঠলের নাম গানে মগ্ন হইতে পার, তাহা হইলে পরমানন্দের অধিকারিণী হইবে।" তুকারাম একাদশটী অভঙ্গে পত্নীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল অভঙ্গ "পূর্ণ-বোধ" নামে পরিচিত। তুকারামের উপদেশের গুণেই হউক, বা নিজের কথা রক্ষার জন্যই হউক, অবলাঈ পরদিন আপনাদিগের সর্ব্বস্ব বিতরণে স্বীকৃতা হইলেন; এবং প্রাতঃস্নানান্তে গৃহস্থালীর সমস্ত সামগ্রী বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপতি বলেন যে, এইরূপে তুকারামের তৈজস পাত্র, বস্ত্রাদি সমস্তই বিতরিত হইল। এমন কি চুল্লীর পাংশু পর্য্যন্ত, সন্ন্যাসীদিগের কার্য্যে লাগিবে বলিয়া, প্রদত্ত হইল। সমস্ত দ্রব্য বিতরিত হইলে একটী দরিদ্রা

স্ত্রীলোক আসিয়া তুকারামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তুকারামের গৃহে তাহাকে দিবার উপযুক্ত অপর কোন সামগ্রীই তখন ছিল না। অবলাঈএর একখানি মাত্র জীর্ণ বস্ত্র অবশিষ্ট ছিল; তুকারাম পত্নীর অজ্ঞাতে তাহাই লইয়া বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন। অবলাঈ এ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার লজ্জানিবারক শেষ বস্ত্রখণ্ড বিতরিত হইল দেখিয়া, আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। এরূপ অবস্থায় যাহা উপযুক্ত, সেইরূপ সুমিষ্ট ভাষায় তুকারামকে পুরস্কৃত করিলেন। অবলাঈএর দোষ, গুণ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাকে মুখরা ও কটুভাষিণী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যে কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছিল, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

তুকারামের রচিত অভঙ্গ হইতে তাঁহার পারিবারিক ঘটনার যে অনেক বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের পতি, পত্নীর কলহ তুকারাম কয়েকটী অভঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। তুকারামের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র প্রদর্শনার্থ তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল;—

সংসারে বিরাগ ওঁর আমারি বেলায় ;
আপনার সুখে কিন্তু ত্রুটী নাই হায়।
সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, সুখ আছেত সকল ,
মোর অপমান শুধু না ঘোচে কেবল ॥
জানাতে দুঃখের কথা যাব কার ঘরে ;
কত জ্বালা স'ব এই সংসারের তরে ?
ছেলে গুলো অন্ন বিনা করে হাহাকার ;
কি দিব তাদের মুখে কি আছে খাবার।
খুলে তারা খাবে মোরে পেটের জ্বালায় ;
মরণ তাদের হলে আপদ জুড়ায় ॥
কর্ত্তা যিনি কোন দ্রব্য না রাখেন ঘরে,
ধুয়ে মুছে ল'ন সব অতিথির তরে ॥
অঙ্গনে গোময় দিতে যদি কভু চাই ;
হা কপাল! তারো মত গরু ঘরে নাই ॥
তুকা বলে, অভাগিনি! নিজে লয়ে ভার
বড় বোঝা বলে এবে কাঁদ কেন আর ?

অপর একটী কবিতা এই :—

পূর্ব্বজন্মে এই মূঢ় ছিল মোর অরি ;
বৈর সাধিতেছে তাই স্বামীরূপ ধরি ॥
সারাটা জীবন হেল সহেনা যে আর ;

পরের সাহায্য কত চা'ব বার বার?
বিঠ্ঠলেরে শতধিক্! কি বলিব তাঁরে;
কিবা ভাল করেছেন মোদের সংসারে?
তুকা বলে, স্ত্রী আমার এইরূপ ভাষে;
কভু রোষে কাঁদে, কভু নিজ মনে হাসে॥

এই শ্রেণীর আরও দুইটী কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কৃত এই দুইটী কবিতার অনুবাদ এমন সরল, স্বাভাবিক ও ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে, যে আমরা স্বতন্ত্র অনুবাদ অনাবশ্যক বিবেচনায়, তাঁহারই অনুবাদ কৃতজ্ঞ-চিত্তে প্রদান করিলাম ;—

ঘরে দুটা অন্ন এলে
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে চা'ন দিতে!
তুকা বলে "অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত"॥
না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে
কতই করিয়াছিনু পাপ।"

তুকা বলে "এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।"
"খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন্ না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে!
কর্ত্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি বাছা,
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রাত্তি,
চলে যান অরণ্যে সদাই"।
তুকা বলে "ধৈর্য্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

তুকারামের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার জন্য অনেকে তাঁহার, গৃহে সম্মিলিত হইতেন। আলস্যের সহচর ভাবিয়া অবলাঈ তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধেও সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদিত একটী অভঙ্গ প্রদত্ত হইতেছে;

"হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে ?"
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে।
"ভাল মুখে দু চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে !
"কোথাও যায় না যারা কভু
ভালবেসে বসে মোর কাছে।
"এও সে বাসে না ভাল হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া,
"সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।"

প্রথম অবস্থায় তুকারামের সাংসারিক সুখ কিরূপ ছিল, এই সকল কবিতাই তাহার প্রমাণ। অনেকে এরূপ অবস্থায় সংসার ত্যাগ অপেক্ষা ভগবানের সেবা ত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা করেন। কিন্তু যাঁহারা সহিষ্ণুতার সহিত লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, পরিণামে তাঁহারাই বিজয়ী হন। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, মুখরা অবলাঈও শেষে তুকারামকে তাঁহার স্বেচ্ছানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তুকারামের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল। কন্যা তিনটীর নাম কাশী, ভাগীরথী ও গঙ্গা; পুত্র দুইটীর নাম মহাদেব ও বিঠোবা। প্রথমা কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইলে অবলাঈ তাহার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তুকারামকে কন্যার বিবাহের কথা বলাতে তুকারাম পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই বৈবাহিক শুভ দিন ছিল। তুকারাম, বাহির হইয়া, রাজপথে ক্রীড়াশীল বালকদিগের মধ্যে আপনার স্বজাতীয় তিনটী বালক মনোনীত করিলেন, এবং তাহাদিগকে নিজের গৃহে আনয়ন করিয়া, একবারেই তিনটী কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহের প্রীতিভোজন করাইবার অবস্থা তাঁহার ছিল না; বাজ্‌রা নামক শস্যের রুটী ও সামান্য একটু দুগ্ধ ইহাই জামাতাদিগকে ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। পরদিন এ সংবাদ পাত্রদিগের পিতা, মাতার গোচর হইল। কিন্তু তুকারামের ন্যায় সাধুপুরুষের সহিত কুটুম্বিতা স্পৃহনীয় ভাবিয়া, তাঁহারা অসন্তোষের পরিবর্ত্তে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রামস্থ লোকেরাও এই উপলক্ষে তুকারামকে উপযুক্ত সাহায্য করিলেন; সকলের অনুগ্রহে বিবাহোৎসব একরূপ সুসম্পন্ন হইল। *

* এই বিবাহ সম্বন্ধে মহীপতি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ বর্ণনা

তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ এরূপ বিস্তৃত হইতে লাগিল যে, অতি দূরদেশ হইতেও অনেকে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবাদ আছে যে, একবার কোন জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য, পণ্টরপুরে বিঠোবার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, তিনি জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা করিলে, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তদনুসারে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে যাইয়া আরাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইল যে, "তুমি দেহুতে যাইয়া তুকারামের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার শিক্ষার জন্য একাদশটী অভঙ্গ রচনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে একটী নারিকেল ফলও ভগবৎপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তুকারামের অভঙ্গগুলি সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে সাধারণ মহারাষ্ট্র-

---

করিয়াছেন। তাঁহার কথা হইতে বোধ হয় যে, তুকারাম একই দিনে, এরূপ ভাবে, তিনটী কন্যার বিবাহ দেন নাই; কোন একটীরই দিয়া থাকিবেন।

ভাষায় রচিত দেখিয়া, জ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্মণের তাহা প্রীতিকর হইল না। তিনি অবজ্ঞার সহিত তাহা দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রতি-গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রতি আর কোন রূপই প্রত্যাদেশ হইল না। এদিকে কোণ্ডোবা নামক অপর একটী নিরহঙ্কার ও অমায়িক প্রকৃতি ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মো-পদেশ লাভের আশায়, বহুদূর হইতে তুকারামের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত অভঙ্গ-গুলি ও নারিকেল ফলটী অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব সম্যক্ পরিস্ফুরিত হইল। তুকারামের রচিত এই অভঙ্গগুলি, "উত্তম জ্ঞান" নামে পরিচিত। তাঁহার শিষ্যগণ এখনও তাহা অতি সমাদরে পাঠ ও গান করিয়া থাকেন। নারিকেল ফলটীর সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একজন ধনী বণিক, আপনার কোন মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে, জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রচুর অর্থ উপহার দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, অভিপ্রেত উপহার যেন তিনি তুকারামকেই প্রদান করেন। পাছে নিস্পৃহচিত্ত তুকারাম তাঁহার প্রদত্ত অর্থগ্রহণে অস্বী-কৃত হন, সেই আশঙ্কায় বণিক্ কৌশলক্রমে নারিকেল

ফলটীর অভ্যন্তর বহুমূল্য মণিমুক্তাদিতে পূর্ণ করিয়া তাহা তুকারামকে প্রদান করিয়াছিলেন। তুকারাম সেই দিনই তাহা প্রথমোক্ত জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখান করাতে কোণ্ডোবা তাহা প্রাপ্ত হন এবং তাহা ভগ্ন করিয়া তাহার অভ্যন্তর মণিমুক্তাদিতে পরিপূর্ণ দেখেন। এই ঘটনাটীর কোন কোন অংশ অতিরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলেও, তুকারামের প্রতিপত্তি এই সময় কিরূপ দেশব্যাপী হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তুকারাম।

অষ্টম অধ্যায়।

তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দেহুর নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক, তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেন। হরিকথাতেই তুকারামের আনন্দ। লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করে, ইহার অপেক্ষা সৌভা-

গ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া তুকারামও, আনন্দিত চিত্তে, হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য, সেই সকল গ্রামে গমন করিতেন। ক্রমে অনেক লোকই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ লোক, যেমন তাঁহাকে সাধু ও ভক্ত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন, ঈর্ষা-কলুষিত, আত্মাভিমানী ধর্ম্মব্যবসায়িগণও তেমনই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীপতি বলেন, "যাহাদিগের অন্তরে বিদ্যা, বয়স, রূপ, জাতি ও কুলের অভিমান প্রবল, সাধুদিগের প্রসাদবাণী তাহাদিগের তৃপ্তিকর হয় না। কাহার কোন্ বংশে জন্ম, কে কোন্ পন্থাবলম্বী, কাহার শাস্ত্রজ্ঞান কতদূর, এই সকল কথা লইয়াই ইহারা মত্ত থাকে। প্রকৃত ধর্ম্ম কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়, সেদিকে তাহাদিগের দৃষ্টি থাকে না।" তুকারাম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকেও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণের নিকট প্রচার করেন, ইহা এই শ্রেণীর লোকদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। দেহুর মোহান্ত মাম্বাজী গোঁসাই তুকারামের সঙ্গে কিরূপ অসৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন,

সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মম্বাজীর ন্যায় রামেশ্বর ভট্ট নামক অপর একজন ব্রাহ্মণও, কিছু-দিন অবধি, তুকারামের প্রতি ততোধিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। মম্বাজী নিজের প্রতিপত্তি লোপের আশঙ্কাতেই তুকারামের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; কিন্তু রামেশ্বর ভট্টের আক্রোশের কারণ অন্যরূপ ছিল। রামেশ্বর নিজে "রাজমান্য," শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া অভিমান করিতেন। তুকা-রাম যেরূপ ভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তিনি তাহা অনুমোদন করিতেন না। সাধারণ শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতগণের ন্যায় তিনিও তুকারামকে একজন অজ্ঞ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চাকারী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তুকারাম ব্রাহ্মণের চিরন্তন অধিকার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার মর্ম্মদাহ হইত। উপদেশ দিতে হইলে ব্রাহ্মণই দিবেন, ভগবৎ-কথা প্রচার করিতে হইলে ব্রাহ্মণই করিবেন, রামেশ্বর ভট্টের এইরূপ সংস্কার ছিল। বণিকপুত্র তুকারাম কে, যে তিনি, ব্রাহ্মণের ন্যায়, আপনাকে লোকের মুক্তিপথের পথপ্রদ-র্শক বলিয়া অভিমান করেন? সুতরাং তাঁহার দর্প চূর্ণ

করা রামেশ্বর অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে দমন করিবার জন্য, যে গ্রামে তুকারামের বাস সেই গ্রামের অধিকারীর নিকট যাইয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া শ্রুতির মর্ম্ম প্রচার করিতেছে; শাস্ত্রানুসারী ক্রিয়াকলাপে উৎসাহদানের পরিবর্ত্তে আপাতমধুর ও মোহোৎপাদক সঙ্গীতাদি দ্বারা সরলচিত্ত লোকদিগকে মতিভ্রান্ত করিতেছে; শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্রাহ্মণসন্তানদিগের নমস্কার গ্রহণ করিতেছে; সনাতন ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত মত "নাম মহিমা" প্রচার ও "ভক্তিপথ" স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তুকারাম ধর্ম্মবিপ্লবকারী, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী ও "পাষণ্ড মতের" পরিপোষক। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য তাহাকে শাসন করা একান্ত আবশ্যক। * রামেশ্বর ভট্ট দেশমান্য ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার

* বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে, শ্রীচৈতন্যকেও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, শূদ্র তুকারাম যে শ্রীচৈতন্যের অপেক্ষা আরও অধিক বিদ্বেষের আস্পদ হইয়াছিলেন, তাহা বলা অতিরিক্ত।

মুখে এই সকল কথা শুনিয়া গ্রামাধিকারী দেহুর “পাটিল” বা পাটওয়ারকে তুকারামের নির্ব্বাসনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পাটিল তুকারামকে, প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া, দেহুত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে বলিলেন। নিরুপায় তুকারাম বিষম বিপদে পড়িলেন। হঠাৎ পিতৃপিতামহের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া সহজ কথা নয়; অথচ গ্রামাধিকারীর অনভিমতে গ্রামে বাসও কিরূপে সম্ভব? অনেক চিন্তার পর, তুকারাম রামেশ্বর ভট্টের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। রামেশ্বর স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন; তুকারাম সেই সময়ে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তুকারাম ভাবিয়াছিলেন যে, যে হরিকথায় পাষাণও বিগলিত হয়, রামেশ্বর তাহা শ্রবণ করিলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত থাকিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া, তিনি, তাঁহার সম্মুখে যাইয়া, আপনার অভ্যাসানুরূপ হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রামেশ্বরের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল না। তিনি বিরক্তির সহিত তুকারামকে বলিলেন, “তুকারাম! তুমি শূদ্র, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন কালে তুমি যে সকল কথা ব্যক্ত কর, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হয়। এরূপ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা গায়ক ও শ্রোতা

উভয়কেই নিরয়ভাগী হইতে হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে।” “বিঠোবার আদেশে কবিতা রচনা করিয়াছি,” তুকারাম এ কথা বলিলে, রামেশ্বর বলিলেন; “বেদশাস্ত্র ও পুরাণে কি ধর্ম্মকথার অভাব আছে যে, তাহা তোমার কবিতার দ্বারা পূর্ণ করিতে বিঠোবা আদেশ করিয়াছেন? তোমার কবিতার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুগণের উপদেশাবলী বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমার কবিতার সুমিষ্ট আস্বাদন পাইয়া লোকে আর পূর্ব্ব সাধুগণের রচনা পাঠ করিবার আয়াস স্বীকার করে না। তোমার দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের অনিষ্ট হইতেছে। অতএব তুমি এখন হইতে আর কখনও এরূপ ভাবে সঙ্কীর্ত্তন ও কবিতা রচনা করিও না।” ব্রাহ্মণভক্ত তুকারাম “প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য” এই বলিয়া রামেশ্বরের কথার উত্তর দিলেন, এবং তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন “আমি একাল পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে প্রভুর আদেশ কি, জানিতে ইচ্ছা করি।” ধর্ম্মাভিমানে পরিপূর্ণ রামেশ্বর বলিলেন, “সেই সকল কবিতা ইন্দ্রায়ণীর জলে লইয়া নিক্ষেপ কর।” তুকারামের হৃদয় এই নিদারুণ আদেশে ব্যথিত হইল; কিন্তু তিনি হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত না করিয়া, “যে আজ্ঞা,

তাহাই হইবে," এই বলিয়া রামেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক, প্রস্থান করিলেন। রচনা উৎকৃষ্ট হউক, বা অপকৃষ্ট হউক, রচয়িতার পক্ষে তাহা বহুমূল্য। নিজের পুত্রকন্যার ন্যায় নিজের রচনারও প্রতি লোকের মমতা জন্মে; সুতরাং রামেশ্বরের নিষ্ঠুর আদেশে তুকারাম যে মর্ম্মপীড়িত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ তুকারাম, যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নাম, যশ, বা অর্থলাভের জন্য করেন নাই। প্রাণের নিগূঢ় কথা প্রাণারামকে জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতাই তাঁহার সর্ব্বস্ব ও আরামের স্থল ছিল। রামেশ্বর, তাহা ধ্বংশ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, প্রকারান্তরে তাঁহার সর্ব্বস্ব নাশেরই আদেশ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁহার আদেশ সর্ব্বথা শিরোধার্য্য, এইরূপ সংস্কারে তুকারাম রামেশ্বরের আজ্ঞার প্রতিবাদ করেন নাই; এবং অন্তরে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেও তিনি কবিতাগুলি ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যে তুকারাম আপনার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারমূলক কাগজ গুলি স্বহস্তে নদীজলে নিক্ষেপ করিবার সময়ে বিন্দু মাত্রও

বিচলিত হন নাই, স্বরচিত কবিতাগুলি নিক্ষেপ করিবার চিন্তায় তিনি শিশুর ন্যায় অধীর হইলেন। তুকারাম জানিতেন যে, কবিতাগুলি, যেদিন, বিঠোবার চরণে উৎসৃষ্ট হইয়াছে,সেই দিন হইতে তাহা আর তাঁহার নহে; তাঁহার প্রিয়তম বিঠোবারই; সুতরাং বিঠোবার সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া তিনি কিরূপে তাঁহার সমীপস্থ হইবেন, ইহাই তাঁহার ভাবনা হইল। .বিঠোবার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, তিনি অশ্রু-প্রবাহ রোধ করিতে পারিলেননা। নূতন কবিতা রচনা করিয়া যে তিনি হৃদয়ের বেদনা উপশম করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না।.রামেশ্বর তাহাও নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং তুকারামের ক্লেশ অসহনীয় হইল। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, সকলেরই স্থান অধিকার করেন। সুতরাং শিশু যেমন মাতার নিকট যাইয়া আপনার দুঃখ নিবেদন করে, তুকারামও তেমনই বিঠোবাকে সম্বোধন করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, আপনার বেদনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন; "প্রভো! তুমি সকলেরই কর্ত্তা, তুমিই আমাকে এই সকল কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলে; আজ তুমিই আবার তাহা ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষেপ করিবার

জন্য ব্রাহ্মণের মুখে আদেশ প্রচার করিতেছ; তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক।” এই বলিয়া, তুকারাম স্বরচিত কবিতাগুলি পাষাণ-ফলকে আবদ্ধ ও উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া, বিঠ্‌ঠলের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন; এবং ভক্ত যেমন প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগমন করে, সেই রূপ উদাসহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কুটিলস্বভাব লোকেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে বিরত হইল না। তাহারা বলিল, তুকারাম আপনাকে সাধু মোহান্ত বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভালই হইল যে, রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় একজন সাধু পুরুষের দ্বারা তাহার কুটিলতা ভেদ হইল। তুকারাম প্রথম প্রথম এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিজের ইচ্ছানুরূপ পূজা, ধ্যান ইত্যাদিতেই নিমগ্ন থাকিতেন; কিন্তু গ্রামের সকল লোক যখন একবাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল যে, “তুকারাম, পূর্ব্বে আপনার বৈষয়িক কাগজপত্রগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার ঐহিক সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াছিল; এক্ষণে আপনার একমাত্র সম্বল কবিতাগুলিও নিক্ষেপ করিয়া নিজের পারত্রিক সম্পদ বিসর্জ্জন

করিল ;” তখন তিনি আর সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিলেননা। অন্ন, জল ত্যাগ করিয়া, তুকারাম বিঠোবার মন্দিরের সম্মুখে যে তুলসীমঞ্চ ছিল, তাহারই নিকটে একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। দিবারাত্রির মধ্যে তিনি কখনও সে স্থান ত্যাগ করিতেন না, বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। মহীপতি ও তাঁহার অন্যতর চরিতাখ্যায়ক গোপালবাবা বলেন, তুকারাম এই ভাবে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহন করিলে দেহুর লোকদিগের প্রতি বিঠোবার স্বপ্নাদেশ হইল যে, “আমি তুকারামের কবিতাগুলি জলের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়াছি, তোমরা যাইয়া তাহা উদ্ধার কর।” তৎপরদিন গ্রামের লোকেরা সেই সকল কবিতা প্রাপ্ত হইয়া তুকারামকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃতজ্ঞ তুকারাম এই উপলক্ষে সাতটী অভঙ্গ রচনা করিয়া বিঠোবার বন্দনা করিয়াছেন।

এদিকে রামেশ্বর ভট্ট, তুকারামকে তাঁহার কবিতাগুলি ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, শিষ্যগণের সহিত “নাগনাথ” নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের পূজা করিবার জন্য গমন করিতেছিলেন। পথমধ্যে তিনি কোন মুসলমান ফকীরের উদ্যানে প্রবেশ

করিয়া, তন্মধ্যস্থ জলাশয়ে স্নান করিলেন। ফকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রামেশ্বর উত্তর প্রদান না করিয়া, উদ্ধত ভাবে তাঁহার প্রতি অবমান-জনক ভাষা প্রয়োগ করিলেন। গোপাল বাবা বলেন, এইরূপ অহঙ্কৃত ব্যবহারের জন্য, ফকীরের অভিশাপে স্নানের পর হইতেই রামেশ্বর ভট্টের বিষম গাত্রদাহ আরব্ধ হইল। কিছুতেই তিনি তাহা প্রশমন করিতে পারিলেননা। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ফকীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু রামেশ্বর ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমান ফকীরের শরণাপন্ন হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি, গাত্রদাহ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্থলে যাইয়া, আশ্রয়-প্রার্থী হইলেন। অনেকেই বলিতেছিলেন যে, তুকা-রামের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্যই তাঁহার সেই অপ্রতিবিধেয় গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। রামেশ্বরও এক দিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, জ্ঞানেশ্বর তাঁহাকে বলিতে-ছেন,—"তুমি ভগবদ্ভক্ত তুকারামের অনিষ্টাচরণ করাতেই তোমার সুকৃত বিনষ্ট হইয়া এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। তুকা-রামের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন তোমার আর মঙ্গল নাই।" তুকারামের অভঙ্গসমূহের উদ্ধার সংবাদও

এই সময় রামেশ্বরের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তখন আত্মকৃত কার্য্যের জন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া, রামেশ্বর তুকারামের নিকট তাঁহার স্তুতিপূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করিলেন। রামেশ্বর তুকারামের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও,তুকারাম তাঁহার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হন নাই। তিনি, রামেশ্বরের শিষ্যগণের মুখে ভট্টের দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে, নিম্নলিখিত অভঙ্গটী রচনা করিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

হৃদয় নির্ম্মল হলে, শত্রুদল
সুহৃদ্ সমান হয়।
শার্দ্দূল ভীষণ না করে হিংসন,
নাহি দংশে ফণীচয়॥
বিষম গরলে সুধাফল ফলে,
বিপদ সম্পদ প্রায়॥
নিষিদ্ধ করম হয় সে ধরম,
সন্তাপে আনন্দ হায়!
দীপ্ত হুতাশন না করে দহন,
বহ্নিশিখা স্নিগ্ধ হয়॥

এই ভাবি মনে যেন জীবগণে
প্রেমে বাঁধা সবে রয়॥
সকলের প্রাণ এ বিশ্বে সমান,
প্রতি জীবে কর প্রীত।
দেব নারায়ণ প্রসন্ন এখন
দেখ ভাবি সুবিহিত॥

মহীপতি বলেন যে, তুকারামের প্রেরিত এই অভঙ্গ পাঠ করিয়া, রামেশ্বরের গাত্রদাহ নিবারিত হইল, এবং তুকারামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। তুকারাম তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যুদগমন করিবার জন্য, যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, রামেশ্বর, তুকারামের নিকট নিজের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য, বিশেষরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দান করিলে রামেশ্বর বলিলেন, "আপনার প্রেরিত অভঙ্গই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে। এখন হইতে আমি আর আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না।" এই বলিয়া রামেশ্বর বিদ্যা, কুলাভিমান এবং সাংসারিক প্রতিষ্ঠার মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তুকারামের চরণ ধারণ করিলেন। এই সময় হইতে রামেশ্বর তুকারামের অনু-

রাগী ভক্ত হইয়া,তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের ন্যায়,সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে,ধ্রুবা ধারণ পূর্ব্বক,তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিতেন। সত্যেন্দ্র বাবু রামেশ্বর ভট্টের এই পরিবর্ত্তন অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "বোম্বাই চিত্র" হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত হইল ;—

"এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল—যাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে দেবতা-রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হইল যে, "ভগবন্ত জনের কোন জাতি নাই। যেমন শাল-গ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যা-ত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ স্পর্শে না। দশগ্রন্থ বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, পুরাণ, ভগবদ্গীতা প্রত্যহ পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাত্যভিমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন,—তিনি বিঠোবার চরণদাস, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই।"* এইরূপ তুকার প্রতি

* গোপাল বাবার কৃত তুকারাম চরিতের বর্ণনানুসারে, রামেশ্বরের

রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল ও তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, নিজেই তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

এইরূপ আরও অনেকবার তুকারামকে অনেক লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শিবাজী নামক একজন কাংশ্যকার ছিলেন। শিবাজী প্রথমে অত্যন্ত সংসারাসক্ত, কৃপণ স্বভাব ও তুকারামের

প্রতি জ্ঞানেশ্বরের প্রত্যাদেশ হইবার পূর্ব্বেই তুকারাম, তাঁহার দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে এক অভঙ্গ প্রেরণ করেন। রামেশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে তুকারামের শিষ্য তাঁহার সান্ত্বনার জন্য উক্ত অভঙ্গ লইয়া উপস্থিত হন এবং উহা দ্বারা রামেশ্বরের তাপ নিবারিত হয়। তিনি তুকারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করেন। এদিকে শিষ্যকে রামেশ্বরের সান্তনার জন্য অভঙ্গ সহ প্রেরণ করিয়া তুকারাম নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। পাছে তিনি স্বয়ং সান্ত্বনা করিতে না গেলে রামেশ্বর দুঃখিত হন, এই ভাবিয়া তুকারাম স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন। তুকারামের প্রেরিত অভঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া ও তুকারামের মহত্ত্ব চিন্তা করিয়া, রামেশ্বর তাঁহার উদ্দেশে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছিলেন; এমন সময়ে তুকা সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

বিশেষ বিদ্বেষ্টা ছিলেন। কিন্তু তুকারামের উপদেশ গুণে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শিবাজী, সংসার-ধর্ম্ম ছাড়িয়া, তুকারামের সহবাসে দিনপাত করিতে ও "সাধু সন্তদিগের" সেবায় অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে, কাংশ্য-কার পত্নীর ইহা অসহ্য হইল। তুকারামই সকল অনি-ষ্টের মূল ভাবিয়া, সেই দুর্ব্বৃত্তা, তুকারামকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক, স্নানকালে তাঁহার শরীরে এমন উষ্ণজল নিক্ষেপ করিল যে, তুকারামের সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিঠোবার চরণে যাতনা উপ-শমের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাংশ্যকার পত্নীর প্রতি একটীবারও কোন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার যন্ত্রণা প্রশমিত হইল। তুকারাম এই উপলক্ষ্যে যে অভঙ্গটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

প্রচণ্ড অনলে দেহ করিছে দহন ;
এ সময় কোথা হরি করগো রক্ষণ ॥
জনক, জননী প্রভু তুমিই আমার ;
এস তবে কৃপা করি এস একবার ॥
আপাদ মস্তক হের দহিছে অনলে।
সহিবারে নাহি পারি ভাসি আঁখি জলে ॥

ভেঙে বুঝি গেল বুক, সহেনা যে আর,
দাঁড়াইয়া কি দেখিছ ওহে কৃপাধার।
শান্তির সলিল লয়ে এস ত্বরা করি,
তোমা বিনা কেবা মোরে উদ্ধারিবে হরি!
তুকা বলে, তুমিত গো জননী আমার;
তোমা বিনা কেবা মোরে করিবে নিস্তার॥

দুর্ব্বৃত্তা কাংস্যকার-পত্নী তুকারামের উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; আহারের সময়েও তাঁহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় তুকারাম তাহা হইতেও অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন, তুকারামের প্রতি এই-রূপ ব্যবহারের ফলে, পাপিষ্ঠা কাংস্যকার পত্নী অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়াছিল; পরে দয়াময় তুকা-রামের অনুগ্রহে সেই দুর্মোচ্য ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

তুকারামের সহিষ্ণুতার বিষয় আমরা বর্ণন করিয়াছি। তাঁহার আত্মসংযমের একটী দৃষ্টান্তও মহীপতি উল্লেখ করিয়া-ছেন। কথিত আছে যে, একবার একটী যুবতী রমণী, তুকারামের নিকট আসিয়া, আপনার পাপাভিলাষ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছিল; কিন্তু তুকারাম মাতৃসম্বোধনে লজ্জিত

করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাদৃশ আত্মসংযম ছিল বলিয়াই তুকারাম তাঁহার স্বদেশীয় সমাজে এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

তুকারাম।

নবম অধ্যায়।

তুকারাম যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্রীয়জাতির ইতিহাসে বিশেষরূপ স্মরণীয়। একদিকে বাহুবল ও জ্ঞানবল এবং অপর দিকে ভক্তিবল, এই তিনের সম্মিলনে মহারাষ্ট্র-দেশ তখন অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলের অবতার স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার স্বরূপ রামদাস স্বামী* এবং ভক্তি ও প্রেমবলের অবতার স্বরূপ তুকারাম, তিন জন, একই সময়ে, মহারাষ্ট্রীয়জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ

---

* ইনি শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। শিবাজী পারিবারিক ও বৈষয়িক অধিকাংশ কার্য্যই ইহাঁর আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে সম্পন্ন করিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ও সর্ব্বকার্য্যে সক্ষম ছিলেন বলিয়া, ইহাঁর স্বদেশীয়গণ ইঁহাকে "সমর্থ রামদাস স্বামী" এই গৌরব জনক আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন।

করিয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নবশক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই যেন বিধাতা তাঁহাদিগের তিন জনকে এককালে মহারাষ্ট্র দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়, জাতীয় জীবনেও সময়ে সময়ে এমন এক একটী "শুভযোগ" উপস্থিত হয় যে, তখন প্রত্যেক বিষয়েই উন্নতি ও কল্যাণ লক্ষিত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী* মহারাষ্ট্রীয়জাতির ইতিহাসে এই শুভযোগ কাল। বীরবর শিবাজীর বলে বলীয়ান্ হইয়া, মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকগণ যে সময়ে বিজয়নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতি-

* এই সময়ের প্রসঙ্গে কোন মহারাষ্ট্রীয় লেখক এইরূপ বলিয়াছেন; "রাজনীতিক্ষেত্রে রাজা শাহাজী এবং ধর্ম্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে একনাথ স্বামী যাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই যুগে রামদাস প্রভৃতি সাধু পুরুষগণ এবং শিবাজী, তানাজী, ময়ুরপন্থ প্রভৃতি রাজনীতিবিদ্‌গণ তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মারাট্টাগণের সর্ব্ব প্রকার গুণের অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইহার পর এক শতাব্দী মধ্যে মহারাষ্ট্রদেশে যত গুলি পুরুষ-রত্নের একসঙ্গে আবির্ভাব হইয়াছিল, পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও এত অল্পকালের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। এইরূপ পুরুষ-রত্নের বাহুল্য না ঘটিলে কৃতান্তোপম আওরঙ্গজেবের ১২ লক্ষ সৈন্যের সহিত ২৭ বৎসর কাল অবিশ্রাম যুদ্ধ করিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ কখনও আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ"।

ধ্বনিত করিত, তুকারামের রচিত অভঙ্গসমূহ সেই সময়েই গৃহে গৃহে সংকীর্ত্তিত হইয়া, সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় নরনারীকে ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিত। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, শিবাজী কেবল কৌশলের অথবা বাহুবলের দ্বারা মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এক পদে বিচরণ করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের ন্যায়, একমাত্র বাহু-বলের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। মুসলমান জাতির ইতিবৃত্ত ইহার সুন্দর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। মুসলমানগণ যে শত বর্ষের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র হইতে ভারত-সাগর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাহুবলের গুণে নয়; মুসলমান ধর্ম্মবলেও বলীয়ান ছিলেন। মুসলমানদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যেও বাহুবলের সহিত ধর্ম্মবলের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়াই, তাঁহারা বদ্ধসখ্য "পবনাগ্নির" ন্যায় তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই সম্মিলনেরই গুণে, মহারাষ্ট্রীয় জাতি এখনও ভারতের* জাতিসাধারণের

* বুদ্ধি ও বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালিই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত; কিন্তু শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ ও মহানুভব মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গালা

মধ্যে একটী অগ্রবর্ত্তী জাতি রূপে পরিগণিত রহিয়াছেন। শিবাজী ও রামদাস স্বামীর ন্যায় দরিদ্র তুকারামও তাঁহার স্বজাতির মহত্ব সংস্থাপনে কিরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি।

তুকারাম, শিবাজী এবং রামদাসস্বামী, কেবল একই সময়ে আবির্ভূত হন নাই, পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন এবং নিজের নিজের প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুসারে পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তুকারামের সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎ তাঁহাদিগের দুই জনেরই জীবনের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাহা দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়েরই প্রকৃতি সুন্দররূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। শিবাজীর বীরত্বের, ততোধিক তাঁহার বুদ্ধির ও চাতুর্য্যের কথা সাধারণ্যে পরিচিত; কিন্তু তিনি যে কিরূপ ধর্ম্মানুরাগী ও বৈরাগ্যপ্রবণ পুরুষ ছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকই অবগত আছেন। রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলেও, তিনি একজন প্রথিতনামা সন্ন্যাসী হইতেন। রাজপদ তুচ্ছ করিয়া, শিবাজী কিরূপ

দেশেও অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীর কুলে উৎপন্ন পুরুষোত্তম পারম্পর্য্যের গৌরবে আজ সমস্ত ভারতভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

মুনিজনোচিত কঠোরতা ও নিগ্রহ অভ্যাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণে চূর্ণপ্রায় হইলেও,তুকারাম সাংসারিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য কিরূপ ধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎকারে আমরা তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। বাল্যকাল হইতে পুরাণ ও কথকতা শ্রবণে শিবাজীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেও† তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "রাজ্যসাধন রূপ মহাব্রত সম্পন্ন করিতে হইলে, সাধুপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ, উপদেশ ও সঙ্গলাভ নিতান্ত আবশ্যক। শিবাজী সেইজন্য কথনও সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ ত্যাগ করিতেন না। তুকারামের

† দাদাজী কোণ্ডদেব নিজেও তুকারামের বিশেষ গুণপক্ষপাতী ছিলেন। একবার দুইজন ব্রহ্মচারী, তুকারামের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে কোণ্ডদেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তিনি তুকারামকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছিলেন। তুকারাম সেই উপলক্ষে যে সকল অভঙ্গ গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, অভিযোগকারী সন্ন্যাসীদ্বয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দাদাজী,তুকারামকে সমাদর ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক, নিন্দক সন্ন্যাসীদিগকে ভৎসনা করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। দাদাজী তাহাদিগকে গাধায় চড়াইয়া রাজপথে ভ্রমণ করাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামের অনুরোধে তাঁহাদিগের সে দণ্ড রহিত হইয়াছিল।

সদ্‌গুণাবলী এবং তাঁহার কথকতার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। একবার তুকারাম, সংকীর্ত্তন ও কথকতা করিবার জন্য লোহগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন; শিবাজী, শুনিয়া, তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়নের জন্য, সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। তুকারাম শিবাজীর নাম অবগত ছিলেন, এবং ধর্ম্মানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল রাজপুত্র বলিয়া, তিনি মনে মনে তাঁহাকে সম্মান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বহুজনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরপূর্ণ সভায় গমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তুকারাম নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট গমন করিলে পাছে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপায়নাদি গ্রহণ করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতেন। সুতরাং তিনি শিবাজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শিবাজীর কর্ম্মচারী তুকারামের নিকট যাইয়া এইরূপ বলিলেন;—“মহারাজ আপনার দর্শনের জন্য আতুরের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি দর্শন দানে তাঁহাকে সনাথ করুন্।” তুকারাম বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। এক দিকে ধর্ম্মানুরাগী, রাজপুত্র শিবাজীর

ব্যাকুল আহ্বান, অপর দিকে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনময়ী মূর্ত্তি, উভয় চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত সংশয়াকুল হইল। তুকারামের আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক ছিল না। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে, সাক্ষাতের সময়ে, এত অধিক অর্থ উপায়ন দিতেন যে, নিতান্ত নিস্পৃহ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহার প্রলোভন অতিক্রম করা দুরূহ হইত। সুখের, দুঃখের সকল অবস্থাতেই তুকারাম বিঠোবার নিকট হৃদয়ের ভাব নিবেদন করিতেন। শিবাজীর আমন্ত্রণে তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, নিম্নানুবাদিত অভঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইবে ;—

"চাহিনা যে সব, নাথ! কেনগো দিতেছ মোরে ?
নিরন্তর কেন হেন ফেলিছ সঙ্কট ঘোরে ?
সংসার হইতে সদা দূরে রহিবারে চাই ;
মানবের সাথ আর করিতে বাসনা নাই ॥
বিজন বিপিন মাঝে সতত হরষে র'ব ;
জগতের কার(ও) সনে কখনও না কথা ক'ব ॥
এইমাত্র চাহি, প্রভো! যেন দেহ, ধন, জন
বমন সদৃশ পারি করিবারে দরশন ॥
তুকা বলে, পদে তব এই নিবেদন করি।

সকলই তোমারই ইচ্ছা, হে পণ্ঢরপতি হরি ॥*

এ সম্বন্ধে আর একটী অভঙ্গ এইরূপ ;—

সম্ভ্রমের চিহ্ন ছত্র, ঘোটক, মশাল
চলিতে পুণ্যের পথে বড়ই জঞ্জাল ॥
হে পণ্ঢরপতি ! তবে বল, কি কারণে,
চাহিছ বাঁধিতে তার বিষম বন্ধনে ?
সম্মান, ঐশ্বর্য্য, দম্ভ, আড়ম্বর হায় !
শূকর পুরীষ সম ঘৃণা করি তায়।
তুকা বলে, এস হরি ! এস একবার,
বিপদে পতিত আমি, করগো উদ্ধার ॥

শিবাজীকেও তুকারাম তাঁহার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে চারিটী অভঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শিবাজীকে তাঁহার রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সংসারের প্রতি উদাসীন হইলেও, তুকারামের যে সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না, এই সকল অভঙ্গে তাহা প্রতীয়মান হইবে।*

বিশ্বস্রষ্টা এ জগৎ করিয়া সৃজন,
করেছেন আপনার লীলাপ্রকটন ॥

---

* অবলম্বিত মূলের সহিত পার্থক্য বশতঃ আমাদিগের অনুবাদের সহিত সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদে পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রত্যয়,
ধর্ম্মজ্ঞ, চতুর, তুমি সাধু, সদাশয় ॥
গুরুর চরণে তব আছে স্থিরমতি,
বিশ্বাস আছয়ে দৃঢ় ধরমের প্রতি ॥
পবিত্র এ "শিব" নাম সার্থক তোমাতে,
প্রজাদের ভাগ্যসূত্র ধৃত তব হাতে ॥
ধ্যান, যোগ, ব্রত আর যম, আরাধন
করিয়াছে মুক্ত তব সংসারবন্ধন ॥
দেখিতে আমায় তব দৃঢ় অভিলাষ,
পত্রেতে তোমার তাহা করেছ প্রকাশ ॥
কিন্তু নিবেদন মোর শুন, নরবর !
দিতেছি পত্রের তব এই সদুত্তর ॥
কাননিবাসী আমি, উদাসীন বেশে,
বাসনাবিহীন হয়ে ভ্রমি দেশে, দেশে ॥
বস্ত্র বিনা ধূলিময়, অতি কদাকার,
ক্ষীণ দেহ, করি নিত্য ফলমূলাহার ॥
শুষ্ক কর পদ, সদা বিকট মূরতি,
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি ॥
বন্ধুভাবে এই আমি করি নিবেদন,
মোরে দেখিবার কথা তুলো না রাজন ॥

যাব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল ?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল ॥
সদয় তোমারে সর্ব্বঅন্তর্যামী যিনি,
তাই লিখিতেছি হেন সবিনয় বাণী ॥
তা না হলে বিঠ্‌ঠলের সেবক যে জন,
কৃপার ভিকারী সে ত নহে কদাচন ॥
রক্ষক, পোষক মোর প্রভু ভগবান,
কেবা আছে এ জগতে তাঁহার সমান ॥
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি, ছিল যত অভিলাষ ॥
ত্যজিয়া বিষয়-তৃষা সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম ॥
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্‌ঠলের তরে ॥
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারায়ণ,
তোমারেও তাঁর মাঝে করি দরশন ॥
ভাবিতাম তোমারেও বিঠ্‌ঠল বলিয়া,
কেন তবে হেন লিপি দিলে পাঠাইয়া ?
সাধুগুরু রামদাস, শিষ্য তুমি তাঁর,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার ॥

অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়,
তাঁর প্রতি ভক্তি তবে কিসে রবে হায় ॥
তুকা বলে, শুন ওগো বুদ্ধির সাগর!
ভক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরন্তর ॥

মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে ক্ষুধা নাশ,
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস ॥
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন,
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ ॥
পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে,
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে ॥
সম্মান প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়।
কিন্তু বল, শান্তি কভু মিলে কি সেথায়?
সমাদর পায় সেথা ধনবান জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মিলে কখন্ ॥
বেশ, ভূষা, আড়ম্বর হেরিলে নয়নে,
মৃত্যু সম বিভীষণ বোধ হয় মনে ॥
হয় ত এ সব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিরক্ত আমার প্রতি হবে তব মন ॥
কিন্তু আমি জানি ভাল অন্তর্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হবেন তিনি ॥

গরীয়ান সেই জন, সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যার ;
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
কামনা থাকিলে সেত নীচের সমান।
তুকা বলে, ধনি জন ! তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির-ভাগ্যবান্ ॥

এই মহাযোগ নিত্য সাধিও যতনে,
শুভ যাহা, ঘৃণা কভু করিও না মনে ॥
যে কার্য্য করিলে হয় পাপের সঞ্চার,
যতনে করিও তাহা নিত্য পরিহার ॥
তোমার অধীনে যদি থাকে খল জন,
তাদের বচনে কভু নাহি দিও মন ॥
গুণী কেবা, রাজ্য কেবা করিছে রক্ষণ,
বিচার করিয়া তুমি দেখিবে রাজন ॥
সকলই ত জান, ভূপ ! কি বলিব আমি,
অনাথ দুর্ব্বলে কভু ভুলিওনা তুমি ॥
শুনিলে এ গুণ, তব প্রীতি পাব মনে,
নাহি কায, নরনাথ ! বৃথা দরশনে ॥
সাক্ষাতে না হ'বে, ভূপ ! কোন ফলোদয়,
বৃথা কাযে দিন মাত্র হইবেক ক্ষয় ॥

তু একটী কায যাহা ভাল বুঝি মনে,
হ'ক্ ভ্রম, তাই লয়ে রহিব যতনে॥
সর্ব্বজীবে এক আত্মা দেব নারায়ণ,
এই সার কথা সদা রাখিও স্মরণ॥
আত্মা-রামে চিত্ত সদা স্থাপন করিবে,
গুরু রামদাসে নিত্য আত্মায় হেরিবে॥
মানব জনম তব ধন্য নরপতি!
তোমার গৌরবে আজ পূর্ণ বসুমতী॥

কথিত আছে যে, বীরবর আলেক্‌জান্দর, প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌—দার্শনিক দায়োজিনিসের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আনয়নার্থ, দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দায়োজিনিস্ তাঁহার নিকট গমনে অস্বীকৃত হইলে, আলেক্‌জান্দর নিজেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুকারাম ও শিবাজীর সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তুকারামের প্রেরিত অভঙ্গসমূহ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, শিবাজীর তাঁহাকে দর্শনের ইচ্ছা আরও বলবতী হইল। তিনি [illegible] লঙ্কার ও পূজার উপচার সামগ্রী এবং বহুমূল্য উপায়নাদি সঙ্গে লইয়া, সানুচর তাঁহার নিকট লোহগ্রামে আগমন করিলেন। তুকারামকে প্রণাম ও অর্চ্চনানন্তর শিবাজী, একটী পাত্র স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া

তাহা তুকারামের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। পাছে শিবাজী তাঁহাকে কোনরূপ উপহার প্রদান করেন, এই আশঙ্কায় তুকারাম তাঁহার নিকট গমন করেন নাই। এক্ষণে শিবাজীকে এইরূপ উপায়ন প্রদান করিতে দেখিয়া, তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "রাজপুত্র! যাহারা হরির সেবক, তাহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তুমি আমাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই। হরিভক্ত হইয়া আমরা কলির প্রধান বন্ধন মোহ ও আশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। বিঠোবাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব; তাঁহার কৃপায় আমরা (হরিভক্তগণ) ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। বিঠোবা আমাদিগের জনক, জননী; তাঁহার বলে আমরা অসীম বলীয়ান্। সমগ্র বৈকুণ্ঠ এক্ষণে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে এবং সর্ব্বত্র আমাদিগের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধন, প্রভুতা ও বল, এই তিনটীতেই রাজার রাজপদ; কিন্তু বিঠোবার কৃপায় এই তিন বিষয়েই আমরা রাজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি যাহাতে আনন্দ করি, তুমিও তাহা কর। হরিনাম গান

কর; কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ কর, এবং একাদশী-ব্রত পালন করিয়া, আপনাকে হরিদাস রূপে পরিণত কর; তাহা হইলেই আমার সন্তোষ বিধান করা হইবে।"

আলেক্জান্দরের সহিত দায়োজিনিসের ব্যবহার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছে। তাহার সহিত পাঠক তুকারামেরও নিস্পৃহতা ও দৃঢ়চিত্ততা তুলনা করুন্। মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি তুকারামের দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; অথচ চীরধারী তুকারাম তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণরাশির দিকে একবার দৃষ্টি মাত্র নিক্ষেপ করিতেছেন না; এদৃশ্য বাস্তবিকই অবলোকনীয় এবং কবির লেখনীতে ও চিত্রকরের তুলিকায় অমর হইবার যোগ্য।

শিবাজী তুকারামের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি তুকারামের প্রত্যাখ্যাত ধন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার আশায় কয়েক দিন লোহগ্রামে অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন সশিষ্য তুকারাম, মহোৎসাহে, সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। ভক্তগণের আনন্দোচ্ছ্বাসে এবং মধুর বীণা ও মৃদঙ্গধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইত। শ্রোতাগণের সপ্রেম একাগ্রতায় এবং তুকারামের ভক্তিপ্রধান উপদেশ-গুণে সঙ্কীর্ত্তন অতি

মধুর ও হৃদয়স্পর্শী হইত। শিবাজী বিমোহিত হইলেন। এক দিন তুকারাম নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সঙ্কীর্ত্তন করিলেন ;—

হরি! তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে!
সুহৃদ্, সখা তুমি, তুমি মম ধন, জন ;
প্রাণরমণ তুমি, শান্তি-সদন হে ॥
আপন বলিতে মম তোমা বিনা কেহ নাই,
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে ॥
ত্রিভুবন পূর্ণ করি, রহিয়াছ তুমি হরি!
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে॥
তব গুণ যে রসনা, প্রভু না করে ঘোষণা,
বিনাশ মঙ্গল তার কি ফল রহিয়া হে ॥
যথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থস্থান,
না ভ্রমিল যদি পদ কি ফল তাহায় হে ॥
সব সুখ ত্যজ্য করি, তব শ্রীচরণে হরি!
তনু, মন, প্রাণ মম করেছি অর্পণ হে ॥
বিনা তব গুণ-গাথা, অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু; চাহিনা শুনিতে হে ॥
এ বিষম ভবনদী, তরিবারে চাহ যদি,
এস সবে সে চরণে লইগে স্মরণ হে ॥

তুকারাম, ভক্তি-গদ্গদ কণ্ঠে এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনানন্তর, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে মানসিক বলে তিনি দ্বারস্থ রাজপুত্রকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার সহিত তুলনা করিতে ভীত হন নাই, সঙ্কীর্ত্তন ও আরাধনা কালে তাহার বিকাশ দর্শন করিয়া শিবাজী বিস্মিত হইলেন। অক্ষৌহিনী-পতির শক্তির অপেক্ষা এরূপ সন্ন্যাসীর শক্তি অধিক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল এবং নিজের রাজপদ অপেক্ষা তুকারামের সন্ন্যাসী-পদ তিনি শ্লাঘ্য বিবেচনা করিলেন। তুকারামের ন্যায় তিনিও নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তনের পর, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে, মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া, অন্যান্য সকলে আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন; কিন্তু শিবাজী গৃহে না যাইয়া তুকারামকে নমস্কার পূর্ব্বক, রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং আপনার কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা দিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন কোন কারণে তাঁহার নিকট গমন না করেন। দিবসে এইরূপ নির্জ্জন বাসের পর শিবাজী রাত্রিতে তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেন। এইরূপে কয়দিন অতীত হইল। তখন তাঁহার

ব্যবহারে ভীত হইয়া, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার জননী জিজিবাইকে এই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। জিজিবাই শুনিবামাত্র ব্যাকুল হৃদয়ে লোহগ্রামে উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর কর্ম্মচারিগণ জিজিবাইকে বলিয়াছিলেন যে, তুকারাম হইতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিবাজী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। জিজিবাই শুনিয়া তুকারামের শরণাপন্না হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন;—"আমার একটী মাত্র পুত্র আপনার উপদেশে সংসারত্যাগী হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পুত্র, কন্যা হয় নাই; সুতরাং আমাদিগের বংশের স্থিতি ও রাজ্য রক্ষা কে করিবে? আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার পুত্রটীকে আমায় ভিক্ষা দিন।" এই বলিয়া তিনি, অঞ্চল প্রসারণ পূর্ব্বক, তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। করুণহৃদয় তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, "শিবাজী সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিলে, আমি তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান দ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে প্রবিষ্ট করাইব; আপনি চিন্তিত হইবেন না; বিঠোবার ভজন করুন্, তিনি আপনার দুঃখ দূর করিবেন।" অনন্তর রাত্রিতে শিবাজী সঙ্কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইলে, তুকারাম তাঁহাকে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান

পূর্ব্বক বলিলেন ;—"সৎকর্ম্মই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলেন, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই; অপরের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার আচরণে কোন ফল লাভ হয় না। বিধাতা মানবসমাজ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং সকলেই নিজের নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই শ্রুতির আদেশ। যে শ্রুতিবাক্য প্রতিপালন না করে, সে অধঃপতিত হয়।" এই বলিয়া তুকারাম ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, শিবাজীকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিলেন, "সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুজয় ও প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভোগ-সুখাভিলাষী ব্যক্তি, নিজের অবয়বের পুষ্টিসাধন করিয়া, যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, নরপতিগণও স্ব স্ব প্রজাপুঞ্জকে সুখী দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করেন। সদ্বিবেকের সহিত প্রজাপালন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয়গণ অনৈষ্ঠুর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রজাপুঞ্জের সুখে সুখানুভূতি, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্বকালে হরিস্মরণ দ্বারা ভগবানের করুণা লাভ করেন; তাঁহাদিগের পক্ষে অরণ্যাশ্রয়ের কোন আবশ্যক নাই, ভগবান স্বয়ং আসিয়াই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন।" তুকারামের এইরূপ

উপদেশে শিবাজীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ছত্র, চামরাদি রাজচিহ্ন সমুদায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন এবং জিজিবাইএর সহিত কয়েকদিন সেখানে বাস করিয়া, তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইলেন। অঞ্চলের নিধি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া, জিজিবাইয়ের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল; তিনি তুকারামকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অবস্থানের পর শিবাজী, তুকারামের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর শিবাজী কখনও তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না। একবার পুনায় তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন-কালে, শিবাজী পুনা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী সিংহগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু তুকারামের সঙ্কীর্ত্তনের তিনি এমনই অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, যে কয়দিন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার প্রতিদিনই তিনি সিংহগড় হইতে পুনায় গমনাগমন করিতেন। মহীপতি বলেন যে, এই উপলক্ষে একবার কতকগুলি মুসলমান সৈনিক, সুযোগ বুঝিয়া, শিবাজীকে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। শিবাজী আত্মরক্ষার জন্য সঙ্কীর্ত্তন-স্থল পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, তুকারাম

তাঁহাকে নিবারণ করেন এবং পরে তুকারামের প্রার্থনায় বিঠোবা স্বয়ং আসিয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। যিনি শ্রীভগবানের ভক্ত তিনি যে তাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া, সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহা, বিস্ময়ের বিষয় নয় ?

দশম অধ্যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়জাতির কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছিল, পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। সূর্য্যের প্রথম রশ্মি পৃথিবীতে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে, আলোকমণ্ডিত আকাশ যেমন তাঁহার উদয় সূচনা করে, সেইরূপ কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, দুই একজন পূর্ব্বগামী সাধুপুরুষ তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া রাখেন। এই সকল সাধু-পুরুষদিগের দ্বারা উত্তরকালীন মহাপুরুষদিগের পথ পরিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে জন-দি-ব্যাপ্টিষ্টের আবির্ভাব ইহার সর্ব্বজনপরিচিত উদাহরণ। আমাদিগের বঙ্গদেশেও শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব

ভক্তগণ তাঁহার আগমনসূচক ভেরী নিনাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যাংশে সুপ্রসিদ্ধ একনাথ স্বামী মহারাষ্ট্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিরোভাবের সমকালেই রামদাস স্বামী আবির্ভূত হন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তুকারামের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশে যেমন শ্রীচৈতন্যের সমকালে নিত্যানন্দ, সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশেও তেমনই জয়রাম স্বামী, রঙ্গনাথ স্বামী, কেশব স্বামী, বোধ্‌লে বাবা প্রভৃতি ভক্তসাধুগণ তুকারামের সমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের ন্যায় ইঁহারাও, শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া, ভক্তি ধর্ম্মের সরস ভাব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্মের ন্যায় ইঁহাদিগেরও প্রচারিত ধর্ম্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভক্তিগুণে আচণ্ডাল সকলেই মুক্তির অধিকারী, এই মহাসত্য তাঁহারাও প্রচার করিয়াছিলেন। তুকারাম যে সমরকোলাহলপূর্ণ তাৎকালীন মহারাষ্ট্রদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইঁহারাও কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসাযোগ্য।

তুকারাম শূদ্র হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণোচিত তাদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা, সামাজিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া থাকে। কিন্তু আহারে ও সামাজিক ব্যবহারে জাতিভেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেও ভারতবাসিগণ জাতি বিচার করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের সম্মাননায় কুণ্ঠিত নহেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন, তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাপাত্র ও সম্মান-ভাজন। ব্রাহ্মণত্বপ্রধান ভারতের অনেকগুলি প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণেতর জাতিতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ও নানক ক্ষত্রিয়, তুকারাম শূদ্র, কবীর জোলা, তিরু-বল্লিয়ার পারিয়া বা চণ্ডাল।* ইহাঁদিগের সমকালীন ব্যক্তিগণ ইহাঁদিগকে দেবশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া সম্মান করিতেন এবং এখনও ইহাঁরা দেবোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভারতবাসিদিগের এইরূপ উদারতাই তুকারামের সম্মানের কারণ। ধর্ম্মাভিমানে বা জাত্যভিমানে অন্ধ ব্যক্তি সকল দেশেই আছেন;

* ইনি তামিলভাষীদিগের তুকারাম। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোন কোন স্থানে ইহাঁর মূর্ত্তি দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ভারতবাসীর যাহা সাধারণ সংস্কার আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

তুকারামের সমকালবর্ত্তী হিন্দু-সাধুগণের ন্যায় কয়েকজন মুসলমান সাধুরও নাম আমরা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাই। মুসলমান হইয়াও, ইহাঁরা হিন্দুধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখ মহম্মদ নামক কোন মুসলমান সাধুকে তুকারাম ও রামদাস স্বামী প্রভৃতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন। আজন্ম হিন্দুর ন্যায় তিনিও হিন্দু-তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এখন যেমন "পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজন্" বা ধর্ম্ম মহাসভা-আহ্বান করিয়া, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামত জ্ঞাত হইবার চেষ্টা হইতেছে, ভারতের পূর্ব্বকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণও, সেইরূপ কোন তীর্থক্ষেত্রে, তদধিষ্ঠাতা দেবতার উৎসব উপলক্ষে, সম্মিলিত হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন দ্বারা নিজের নিজের

* এখনও এভাব ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। আমাদিগের কোন পরিব্রাজক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে,হিমাচলস্থিত "ব্যাস গুহার" নিকটে এখনও কোন মুসলমান সাধু বাস করিতেছেন। ইহাঁর প্রতিবাসী সাধুগণ ইহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং অনেক সময় ইহাঁর আশ্রমে আসিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা করেন।

ধর্ম্মমত গঠিত ও মার্জ্জিত করিয়া লইতেন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র পণ্ঢরপুরে অনেকবার এইরূপ সাধু সম্মিলন হইয়াছিল। একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ পণ্ঢরপুরে সম্মিলিত হইলে, তুকারামও সেখানে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামদাস স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামদাস স্বামী সে সময় মহারাষ্ট্রদেশের অগ্রগণ্য সাধুপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ বিদ্যা, বুদ্ধির জন্য এবং শিবজীর দীক্ষাগুরু বলিয়া তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না। তুকারাম এবং রামদাস স্বামী উভয়েই পরস্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সুতরাং এই সাক্ষাতে উভয়েই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। প্রত্যেক সাধুই আপন আপন পন্থানুযায়ী পূজা, অর্চ্চনা ও প্রচার আরম্ভ করিলে, তুকারামও তাঁহার অভ্যাসানুরূপ সংকীর্ত্তন ও কথকতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংকীর্ত্তনে সমাগত তীর্থযাত্রিগণ ও সাধুমণ্ডলী বিমুগ্ধ হইলেন। একদিন সাধুগণ তুকারামকে তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, তুকারাম নিম্নলিখিত অভঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ;—

আত্মকথা সাধুগণ বলিবারে নাই ;
কিন্তু জিজ্ঞাসিছ সবে কহিতেছি তাই ॥
শূদ্র জাতি, করিতাম বৈশ্য ব্যবসায়,
পূজিতাম কুলপূজ্য দেব বিঠোবায় ॥
পিতামাতা পরলোকে করিলে গমন,
সহিলাম নিদারুণ দুঃখের পীড়ন ॥
দুর্ভিক্ষের গ্রাসে মোর গেল ধন, মান ;
অন্ন বিনা জ্যেষ্ঠা পত্নী ত্যজিলেন প্রাণ ॥
বড় লজ্জা হ'ল, কিন্তু কি করিব হায় !
ক্ষতি হ'ল, করিলাম যত ব্যবসায় ॥
নিদারুণ ক্লেশ আর না পারি সহিতে।
করিলাম স্থির এই বিচারিয়া চিতে ॥
বিঠোবার ভগ্ন গৃহ সংস্কারি যতনে,
কাটাইব কাল সেথা ভজন, সাধনে ॥
একাদশী দিনে আরম্ভিনু সংকীর্ত্তন ;
অভ্যাস আমার তাহে না ছিল কখন ॥
সাধুগণ বিরচিত গুটী কত গান,
লইনু কণ্ঠস্থ করি হ'য়ে ভক্তিমান ॥
সুগায়কগণ যবে গাইতেন গীত,
ধ্রুবা ধরিতাম আমি হ'য়ে শুদ্ধ চিত ॥

সাধু-পাদোদক নিত্য করিতাম পান ;
লোকভয় অন্তরেতে না দিতাম স্থান ॥
কায়মনোবাক্যে দেহ সঁপি আপনার,
করিতাম যথাসাধ্য পর উপকার ॥
জন্মিল বিরাগ ঘোর সংসারের প্রতি ;
আত্মজন বাক্যে আর না রহিল প্রীতি ॥
সত্যাসত্য সাক্ষী করি আপনার মনে,
লোকের গঞ্জনা বাক্য না শুনি শ্রবণে,
স্বপ্নে গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
করিলাম হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন ॥
কবিত্ব শকতি ক্রমে উপজিল মনে ;
স্থাপন করিনু চিত্ত বিঠোবা চরণে ॥
হইল নিষেধ পরে কবিতা লেখায়।
বড় কষ্টে কয় দিন গিয়াছিল তায় ॥
নিক্ষেপিয়া গ্রন্থ মোর ইন্দ্রায়ণী নীরে,
ত্যজিতে পরাণ গেনু বিঠোবা মন্দিরে ॥
অপার করুণাসিন্ধু দেব নারায়ণ।
কহিলেন মোরে সেথা আশ্বাস-বচন ॥
বিস্তারিয়া কহি যদি সব বিবরণ,
বিলম্ব ঘটিবে বহু, কিবা প্রয়োজন ?

যে দশায় আছি এবে প্রত্যক্ষ সকল।
ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানেন বিঠ্ঠল॥
কৃপাময় হরি মোর নিজ ভক্তগণে,
না ত্যজেন, স্থির ইহা বুঝিয়াছি মনে॥
তুকা বলে পাণ্ডুরঙ্গ যে কথা বলান,
তাহাই সম্বল মোর, নাহি অন্য জ্ঞান॥

তুকারামের বিনীত ব্যবহার ও অকৃত্রিম ভক্তি দর্শন করিয়া, সমবেত সাধুগণ পরমপ্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যের ও নিঃস্বার্থতার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিতেন। আত্মাভিমানশূন্য, সরলস্বভাব তুকারামের নিকট সে প্রশংসা প্রীতিকর বোধ হইত না। তিনি এক দিন একটী অভঙ্গে সাধুগণের নিকট বলিয়াছিলেন;—

এই নিবেদন মোর শুন সাধুগণ!
অধম পতিত আমি, অতি অভাজন॥
আমারে সম্মান হেন উচিত না হয়।
এত সমাদর মোর যোগ্য কভু নয়॥
আমি যে কেমন মোর চিত্ত জানে তাই।
সত্য, সত্য, আজও মোর মুক্তি ঘটে নাই॥

নিজ মনে একজন একভাবে থাকে।
বাহিরের লোক তারে অন্যভাবে দেখে॥
আত্মপরিচয় কিবা কহিব সবায়,
বহুক্লেশ এজীবনে পাইয়াছি হায়!
লাঙ্গুল মর্দ্দন করি বলীবর্দ্দগণে
পারি নাই ব্যবসায়ে পোষিতে স্বজনে॥ *
তাই এ বৈরাগ্য-ব্রত করেছি গ্রহণ,
কি প্রশংসা ইথে মোর আছে, সাধুগণ!
স্বভাবতঃ অর্থ মোর হয়েছিল ক্ষয়,
অল্প মাত্র দানে শুধু করিয়াছি ব্যয়॥
পত্নী, পুত্র প্রতি আমি হইয়া উদাস,
হীনবুদ্ধি মাত্র মোর করেছি প্রকাশ॥
সরম হইল বড় দেখাতে বদন,
আশ্রয় লইনু তাই বিজন কানন॥
আপন উদর-জ্বালা নাশিবার তরে,
নির্ম্মম হইনু, ভুলি আত্ম-পরিবারে॥

---

* ব্যবসায়ীগণ দ্রুতগমনের জন্য আপনাদিগের ভারবাহী বলীবর্দ্দদিগের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া থাকে। তুকারামের এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি বলীবর্দ্দদিগকে প্রহাররূপ অধর্ম্ম কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াও, সংসার প্রতিপালন করিতে পারি নাই। তবে আমার সংসারত্যাগের জন্য প্রশংসা কি?

না ছিল উপায়, বনে গিয়াছিনু তাই,
প্রশংসার কথা, ইথে, কিছুইত নাই॥
থাকিতাম দিবানিশি উদাসীন মনে,
"হাঁ" দিতাম, না বিচারি লোকের বচনে॥
পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর ছিল ভক্তিমান,
তাই আমি বিঠোবায় সঁপিয়াছি প্রাণ॥
আমি যে বৈরাগ্য-ব্রত করেছি গ্রহণ,
সে কেবল সংসারের সহি নিপীড়ন॥
কিন্তু সাধুগণ! মোর চিত্ত এই চায়,
ভক্তিগুণে যেন লোক এই পথে ধায়॥

তুকারাম যে কিরূপ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার এই রূপ অকপট হৃদয়ে মানসিকভাব প্রকাশের চেষ্টাতেই তাহা ব্যক্ত হইবে। তুকারাম প্রতিদিনই পণ্ঢরপুরের উৎসবে সংকীর্ত্তন করিতেন। একদিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন:—

কি আর কহিব, বলহ সকলে, ধরম-করম-নীতি;
সার কথা এই, বিঠোবা চরণে, রাখ সদা স্থিরমতি॥
এ জগত মাঝে, যাহা কিছু আছে, ক্ষর, অক্ষর রূপ;
পণ্ঢরীনাথ, সার তাহার, সে চরণে কর নতি॥

আগম-জলধি, মন্থনে যদি, উঠিল এ নবনীত ;
সার ভাবিয়া, হৃদয়ে রাখিয়া, দিবানিশি কর প্রীতি ॥

সেদিন প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইল এবং সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরদিন সমবেত সাধুগণের উপরোধে রামদাস স্বামী স্বয়ং সংকীর্ত্তন করিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের ও উৎসবের পর, পূর্ণিমার দিন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আদর্শে সাধুগণ (দধি, কাদা) উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুদিগের মধ্যে কেহ নন্দ, কেহ যশোদা, কেহ বালগোপাল সাজিলেন। তুকারাম গোপবালক হইলেন। যিনি যে ভাবে অভিনয় করিতেন, তুকারাম তৎক্ষণাৎ নব, নব অভঙ্গ রচনা করিয়া তাঁহার অভিনীত সেই, সেই ভাব আরও পরিস্ফুট করিতেন। সম্মিলিত দর্শক ও সাধুমণ্ডলীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। বহুদিন পরে বৃন্দাবনের সেই মধুর চিত্র মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইলেন। পুলকাশ্রুতে কত নয়ন সিক্ত এবং কত বক্ষ প্লাবিত হইল। দেশপ্রসিদ্ধ, পলিতকেশ সাধুগণ, এইরূপে বালকের ন্যায়, সরলভাবে, নৃত্যগীতাদি, দ্বারা উৎসবানন্দ ভোগ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। তুকারামের বিনীত ব্যবহারে ও সঙ্কীর্ত্তনের গুণে

অনেক নীরস হৃদয়ও সরস হইল। রামদাস স্বামী একজন "রামায়ৎ" সন্ন্যাসী ছিলেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত, উচ্চবংশ-জাত ব্রাহ্মণ এবং শিবাজীর গুরু বলিয়া, প্রথমাবস্থায়, তিনি কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাভিমানী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভিন্ন অপর কোন দেবমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পণ্ঢরীপুরের সাধুসম্মিলনের পর হইতে তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইল। মূর্ত্তিমান বিনয় ও ভক্তিধর্ম্মরূপী তুকারামকে দর্শন করিয়া, এবং সমাগত সাধুগণের নিষ্ঠা, প্রেম ও পরস্পরের প্রতি উদ্ধতভাবশূন্য ব্যবহার আলোচনা করিয়া, তাঁহার আত্মাভিমান খর্ব্ব হইল। পণ্ঢরপুরে আগমন করিয়া বিঠ্ঠলের মূর্ত্তি দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মনোমোহন মেঘশ্যাম শ্রীরাম! চাপ, বাণ পরিত্যাগ করিয়া তুমি এখানে ইষ্টকোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছ কেন?" কিন্তু পণ্ঢরপুর হইতে প্রতিগমনের সময় তিনি বলিলেন, "সকল স্থানই দেবসত্তায় পরিপূর্ণ, তবে কোন্ তীর্থে গমন করিব?" অনেকে অনুমান করেন যে, তুকারামের সহিত পরিচয়ই রামদাস স্বামীর এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। ইহার পরও রামদাস স্বামীর সঙ্গে তুকারামের কয়েকবার পণ্ঢরপুরে সাক্ষাৎ হইয়া-

ছিল। একবার উত্থানএকাদশীর উৎসব উপলক্ষে তথায় সাধু সম্মিলন হইলে, শিবাজীও সেখানে আগমন করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের নরপতিদিগের ন্যায় শিবাজী সমাগত সাধু, সন্ন্যাসীদিগের যথারীতি অভ্যর্থনা ও সৎকার করিলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মকার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য উৎসবক্ষেত্রে সানুচর বর্ত্তমান রহিলেন। এই সকল উৎসবক্ষেত্রে সাধু, সন্ন্যাসীগণের ন্যায় সন্ন্যাসিনীগণও উপস্থিত থাকিতেন। আকাবাই নাম্নী রামদাস স্বামীর কোন শিষ্যার কথা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিদিগকে রামদাস স্বামীর প্রণীত "দাসবোধ" নামক অধ্যাত্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। পণ্ঢরপুরের উৎসবের পর আমরা তুকারামকে আরও একটী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিতে পাই। শিবাজী, পার্লীগড় নামক কোন গিরিদুর্গে শ্রীরামচন্দ্রের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশের প্রসিদ্ধ সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুকারাম সেখানে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। শিবাজী স্বয়ং এবং আকাবাই, বেণুবাই, প্রভৃতি রামদাস স্বামীর কয়েকজন ধর্ম্মানুরাগিনী শিষ্যাও এই

উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই উৎসবক্ষেত্রে অনেক সঙ্গীতপারদর্শী ও ভক্তিমান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর হওয়াতে, প্রায় এক মাসকাল, সকলে তাঁহারই সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। উৎসব শেষ হইলে, শিবাজী সমাগত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সাধু, সন্ন্যাসীদিগের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামেরও অর্চ্চনার জন্য স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনীত হইল; কিন্তু তুকারাম, শিবাজীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, হঠাৎ যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। শিবাজী তুকারামকে চারিখানি গ্রাম দান করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামের এইরূপ অন্তর্দ্ধানে তাঁহার সে বাসনা, পূর্ণ হইল না। তিনি রামদাস স্বামীর নিকট তুকারামের ব্যবহার সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলে, রামদাস স্বামী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ বলিলেন;—"বৎস! ধার্ম্মিকদিগের নিকট ত্রৈলোক্যের সম্পদও তুচ্ছ। তুকারাম মহাসিদ্ধিকেও পদাঘাত করিয়া নিষ্কামভাবে বিঠোবার ভজনে রত আছেন। চতুর্ব্বিধ মুক্তিও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর; এই

সামান্য পার্থিব সম্পদের আর তাঁহার নিকটে মূল্য কি?" মহীপতি বলেন যে, তুকারামের নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া রামদাস স্বামী বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তুকা-রামের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তুকারাম প্রত্যেক আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী একাদশী উপ-লক্ষে পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। একবার পীড়ার জন্য সেখানে গমন করিতে পারেন নাই। দৈনিক অন্ন, জল প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার তাদৃশ ক্লেশ বোধ হইত না, কিন্তু নিরূপিত ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাঘাত ঘটিলে তুকা-রাম অস্থির হইয়া পড়িতেন। একাদশীর দুই চারিদিন পূর্ব্বে, যখন অন্যান্য সকলে পণ্ঢরপুরে গমনের উদ্-যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তুকারাম মাতৃদর্শনোৎ-সুক বৎসের ন্যায় অধীর হইলেন। তিনি কেবলই ভাবিতেন, 'হায়! আমি এমনই অধম যে, এই পুণ্য দিনে বিঠোবার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম।' ক্রমে পণ্ঢরপুরে যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে, তুকারামের শিষ্য ও অনুচরগণ সমারোহের সহিত ধ্বজপতাকা ও বাদ্যভাণ্ড লইয়া তাঁহার গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলে, তখন তুকারাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি, অতি কষ্টে আপনার গৃহের বহির্দ্দেশস্থ রাজপথে আসিয়া, শিষ্য-

দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন;—"তোমরা গিয়া বিঠোবাকে বলিবে যে, আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে তাঁহার দর্শন দানে বঞ্চিত করিলেন। তিনি আমাকে এখনও যদি একটু বল দেন, আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি এবং ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া নৃত্য করি। তোমরা বিঠোবাকে আমার এই পত্র দিও।" এই বলিয়া তিনি ২৪টী অভঙ্গ শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিলেন।

তুকারামের এই সময়কার মনের অবস্থা প্রকাশক একটী অভঙ্গ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

কেন কেহ আসি নাহি কহে মোরে,
"শুন এই সমাচার।
পণ্ঢরীশ তোমা ডেকেছেন, চল,
বিলম্বে কি ফল আর?
সে বারতা মোর পশিলে শ্রবণে,
ঘুচিবে বিষয়-ফাঁস ;
মাতৃ-গৃহ-পাশে ধাইব ছুটিয়া,
না র'বে সংসার আশ॥
তৃষাতুর আঁখি রহেছে চাহিয়া,
ব্যাকুল সতত মন।

নাহি জানি কবে আসিবে আমার
জননীর নিমন্ত্রণ॥
তুকা বলে মোর অদৃষ্টের গুণে
সুদিন হইবে যবে।
পণ্ডরী নাথের দরশন লভি,
কৃতার্থ হইব তবে॥

আরও একটি অভঙ্গের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

এ চির নশ্বর দেহ নষ্ট হবে হায়!
কেন গোপীনাথ! তবে বিমুখ আমায়?
তোমরা করুণাসিন্ধু কত সাধুজন!
জানায়ো চরণে তাঁর মোর নিবেদন॥
কহিও অগতি তুকা অনাথ, অজ্ঞান;
হে বিঠ্ঠল! তুমি তারে পদে দিও স্থান;
তুকা বলে এই তাঁরে বলো, জ্ঞানিগণ!
অবশ্য তুকারে তিনি দিবেন শরণ॥

অনেকগুলি অভঙ্গের ভাব এরূপ যে, কবিতায় তাহা ব্যক্ত করা সহজ নয়; সেই জন্য আমরা গদ্যে তাহাদিগের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি ;—

"কেহ আসিয়া আমাকে কেন বলে না যে, "দেখ,

পণ্ঢরপুরের জননী তোমাকে ডাকিতেছেন; শীঘ্র চল। তাহা হইলে আমার মনে শান্তি আসিবে এবং জন্ম জন্মান্তরের অবসাদ দূর হইবে। তুকা বলে আমার মা আমাকে "প্রেমপানা" দিবেন।"

"আমাকে দেখা দিতে যদি তোমার এতই সঙ্কোচ হয়, তবে আমাকে প্রসব করিয়াছিলে কেন? আমি, আমার অভাব নিবারণের জন্য, কাহার মুখ পানে চাহিব? কে আমাকে শ্রান্ত, ক্লান্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? যদি হে দেব! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, কোন্ দিকে কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিব? কে আমাকে আদর করিয়া নিকটে ডাকিবে? আমার প্রাণের কষ্ট কে বুঝিবে, কে আমাকে সঙ্কটের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে? তুকা বলে, হে পাণ্ডুরঙ্গ! আমার মনে কি আছে, তাহা তুমিই জানো।"

"তোমার সাক্ষাতের বাসনা হৃদয়ে উদয় হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহা পূর্ণ হইতেছে না। এইজন্য মন অস্থির হইতেছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তপ্ত খোলার মধ্যে খই যেমন ফুটিতে থাকে, আমার মন তেমনই হইতেছে। তুমি বল, কোন্ পাপে আমার চক্ষু এখনও তোমাকে দেখিতে পাইতেছে না। আমার

কপালকে আর কি বলিব ? আমার মন এখনও কেন পণ্ঢরপুরের পথে চলিতেছে না ? আমার এই মস্তক কেন তোমার পদে গিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে না ? করযোড়ে তোমাকে প্রণাম করিয়া আমার হস্তদ্বয় কেন ধন্য হই-তেছে না। আমার জিহ্বা কেন তোমার কীর্ত্তিগান করিয়া পবিত্র হইতেছে না ? তুকা বলে, কবে গিয়া তোমার মহাদ্বারে সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠন করিয়া পড়িব !"

"অনেক দিন হইতে তোমার বচনের আশা লইয়া রহি-য়াছি ; কিন্তু হে পাণ্ডুরঙ্গ ! তুমি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া রহিয়াছ কেন ? এরূপ নিষ্ঠুরতা করাত উচিত নয়। আমাকে কি ভুলিয়া গেলে ; না আমি তোমার পক্ষে এতই ভারী হইয়া পড়িয়াছি ? হে গোবিন্দ ! আমাকে দেখা দেওয়ার অপেক্ষা কোন্ গুরুতর কার্য্যে তুমি ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছ ? তোমার সন্তানের সংখ্যা কি এত অধিক হইয়াছে যে, জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, তুমি আমায় ত্যাগ করিতেছ ?"

"সমর্থের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি দরিদ্র হইয়াছি, জগতে এ কথা প্রচারিত হইয়া তোমারই অখ্যাতি হইতেছে। এখানেও আহার মিলে না, তোমার নিকট হইতেও আহ্বান আসে না ; এ অবস্থায় আমার

বাঁচিয়া থাকা কেবলই বিড়ম্বনা। আমি, তোমার দর্শন-লোলুপ হইয়া,কণ্ঠাগত প্রাণে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার মন তোমার চরণের নিকট আসিয়াছে। তুকা বলে, আমার যেরূপ উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, তাহাতে এখন আমার ধৈর্য্য কিরূপে থাকিবে, বুদ্ধিই বা কিরূপে স্থির থাকিবে? আমার সঙ্গত কথাগুলিতেও তুমি কর্ণপাত করিতেছ না কেন? কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না; তাই ভক্তির সহিত তোমার চরণে শরণ লইতেছি।"

"বধূকে তাহার মাতৃ সমীপে না পাঠাইলে তাহার মন যেরূপ ব্যাকুল হয়, আমার মনও পণ্ঢরপুরে যাইবার জন্য সেইরূপ হইয়াছে। কিন্তু এই জ্বরকে কি করিব? এ চণ্ডাল শ্বশুর, শাশুড়ীর মত আমাকে মাতৃগৃহে প্রেরণ করিতেছে না। হে দাতঃ! আমি কি করিব? তুকা বলে, তোমার দ্বারে গরুড় আছে, সে আসিয়া আমাকে পণ্ঢরী-পুরে লইয়া যাউক্।"

এই সকল অভঙ্গে তুকারামের হৃদয়ের কি ব্যাকুলতা, কি কাতর ভাব প্রকাশিত হইতেছে, পাঠক তাহা অনু-মান করিতে পারিবেন।

যাহা হউক্, তুকারামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া,

তাঁহার শিষ্যগণ পণ্ঢরপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তুকারামের দারুণ ক্লেশ হইতে লাগিল। তিনি সেই পীড়িত অবস্থাতেও ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। শেষে তুকারাম গমন শক্তির অভাবে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তুকারামের কোন চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, 'মাতা যেমন শ্বশুরালয়গামিনী দুহিতাকে বিদায় দান করিয়া, চক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পর্য্যন্ত, সজলনেত্রে সেই দিক পানে চাহিয়া থাকেন এবং দুহিতাও যেমন অশ্রুমোচন ও পিতৃভবনের দিকে পুনঃপুনঃ গ্রীবাবর্ত্তন করিতে করিতে পতিগৃহাভিমুখে অগ্রসর হন, তুকারাম ও তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপ কাতর হৃদয়ে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর তুকারামের শিষ্যগণ পণ্ঢরপুরে গমন করিয়া তুকারামের প্রেরিত অভঙ্গসমূহ বিঠোবাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন, এবং উৎসব সম্পূর্ণ হইলে যথা সময়ে দেহুতে প্রত্যাগমন করিলেন। তুকারাম, যেখানে তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতে সেখানে যাইয়া, তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। পরস্পরের প্রণাম ও অভিবাদনাদির পর তুকারাম তাঁহাদিগকে উৎসবের সবিস্তর বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বিঠোবা তাঁহার প্রেরিত অভঙ্গ প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়া, আনন্দিত চিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

দিন দিন তুকারামের প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তিমান ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ভাবিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অতি দূর-দেশ হইতেও আর্ত্ত, পীড়িত ও ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন ও উপদেশ মহারাষ্ট্র দেশকে সরস ভক্তি-ধারায় অভিষিক্ত করিল। তাঁহার বৈরাগ্য-পূর্ণ অভঙ্গ সমূহ নগরে, পল্লীতে সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তিত এবং লাঙ্গলহস্ত কৃষক ও গোধূম-চূর্ণ-কারিনী দাসী হইতে রাজা, রাজ-কর্ম্মচারী এবং সভাসদ্ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সকলেরই

মুখে গীত হইতে লাগিল। অতি পাষণ্ডগণও তৎশ্রবণে বিগলিত হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিল। নিজের অবলম্বিত ব্রতের এইরূপ সিদ্ধি দর্শন করিয়া তুকারাম আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং জ্ঞানেশ্বরাদি তাঁহার পূর্ব্বগামী সাধুগণ যে সগুণ ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল ভাবিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। সমাজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকা একদিকে যেমন ক্লেশকর, অতিরিক্ত পরিচিত হওয়াও অপর দিকে তেমনই অসুবিধাজনক। বিশেষতঃ সাধুগণের পক্ষে জনসাধারণের সমাদর-ভাজন হওয়া বিশেষরূপ ধর্ম্ম-বিঘ্নোৎপাদক। তাহাতে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, এবং আহার, বিহার এমন কি নিয়মিত পূজা, পাঠ প্রভৃতিতেও স্বাধীনতা থাকে না। জনসমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে তুকারামকে এই অসুবিধা বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইতেন, কেহ তাঁহাকে সুমিষ্ট খাদ্য ভোজন করাইতে চাহিতেন, কেহ বা তাঁহাকে দেবাবতার বা দেবানুগৃহীত পুরুষ ভাবিয়া, অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেন। নিস্পৃহ ও বিনয়ী তুকারামের এ সকল ভাল লাগিত না। সাধ্যানুসারে তিনি সকল

প্রকার সাংসারিক সম্পদ ও গৌরব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে কেহ ব্যথিত হন, এই ভাবিয়া, সম্পূর্ণরূপ নিজের ইচ্ছানুসারেও চলিতে পারিতেন না। ইহার উপর আরও বিপদ ছিল। মৃতবৎসা আসিয়া তাঁহার নিকট সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেন, বিষয়ী নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য অনুরোধ জানাইতেন; দিন নাই, রাত্রি নাই, দলে দলে লোক আসিয়া নানা প্রকার উপরোধ শুনাইতেন। এই সকল কারণে যেরূপ সংযম ও বিরাগের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত, সকল সময় তিনি সেরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি দুঃখিতচিত্তে ভগবানের নিকট বলিতেন, "প্রভো! আর কেন, এইবার আমাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।" অনবরত ব্রত, উপবাস ও জাগরণ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; অথচ মানসিক শ্রমের বিরাম ছিল না। ভক্তবৃন্দকে সমাগত দেখিলেই তিনি সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেন; এবং নূতন, নূতন অভঙ্গ রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন; তখন আর শরীরের দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার পৃথিবীর প্রবাসকাল যে সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, জীবনী-শক্তি

হ্রাসের সঙ্গে তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিতে- ছিলেন। ক্রমশঃ ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভাবস্থার ন্যায় তাঁহার জীবনে পুনর্ব্বার বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য লক্ষিত হইল। মন পার্থিব কোন বস্তুতেই স্থির থাকিত না। এক স্থানে বসিয়া আছেন, হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতেন এবং বলিতেন, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি।" হরি কথা ভিন্ন অপর কথা মুখে আনিতেন না। দিবা রাত্রি হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং প্রতি গ্রাসে ও প্রতি নিশ্বাসে হরিনাম স্মরণ করিতেন। সঙ্কীর্ত্তন কালে প্রায়ই বলিতেন, "হে পণ্ঢরীশ! তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা আর অধিক কষ্টকর কি আছে? আমার আয়ু পরিমিত করিতে চাও, কর; কিন্তু প্রভো! এই করিও, যেন আমার শক্তির হ্রাস না হয়। যত দিন জীবিত থাকিব, যেন আমি শারীরিক শক্তির অভাবে তোমার গুণগান করিতে অসমর্থ না হই।" কি মধুর প্রেম! কি অহেতুকী ভক্তি! এরূপ ভক্তি না থাকিলে কি কখনও ভগবানের কৃপার অধিকারী হইতে পারা যায়?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লোহগ্রামের লোকেরা, তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য, সর্ব্বদা তাঁহাকে

নিমন্ত্রণ করিতেন। তুকারামের সঙ্গ লাভ দ্বারা লোহ-গ্রামবাসিগণ ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ-জনিত সদাচরণ গুণে তাঁহাদিগের পার্থিব সম্পদও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। লোহগ্রামবাসিগণ তুকারামকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তুকারামও তাঁহাদিগের প্রতি তেমনই স্নেহবান ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি অভঙ্গে তিনি লোহগ্রাম সম্বন্ধে আপনার সস্নেহ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লোহগ্রামে যাইয়া এক মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণের সঙ্গে মুসলমানদিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধ চলিতেছিল এবং লুণ্ঠন, হত্যা ও গ্রাম উৎসাদন প্রভৃতি নিষ্ঠুর কার্য্য সকল তখন মহারাষ্ট্রদেশে একরূপ দৈনিক ঘটনাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তুকারামের অবস্থান কালে লোহগ্রাম "পরচক্র" দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে তাহার অধিবাসিগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। গ্রামবাসিদিগকে হৃতসর্ব্বস্ব ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তুকারাম তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দান করিলেন। সকলকে একত্র করিয়া তিনি সুমিষ্ট বাক্যে বলিলেন; "দেখ যে ধন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা গিয়াছে, তাহা ভগবানেরই বিধানে গিয়াছে; সুতরাং

তাহা তাঁহারই সেবায় উৎসৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, সকলে শোক সম্বরণ কর। অন্তরাত্মাস্থিত নারায়ণই সকল প্রকার সুখ, দুঃখের ভোক্তা; শরীরে তপ্ত অঙ্গার পতিত হইলে তিনিই দুঃখ ভোগ করেন; সুতরাং দুঃখ কখনও জীবের নিজের নয়। ভগবান যখন, বিনা মূল্যে, কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য, তখন অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া চিন্তা কি ?"

তুকারাম এইরূপে গ্রামবাসিদিগকে অবস্থানুরূপ সান্ত্বনা দান করিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহার স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত ও উদাস-ভাবাপন্ন হইল। তুকারামের নিজের যদিও কোন ক্ষতি হয় নাই, তথাপি সাধারণের ক্ষতিতে তিনি নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্তের ন্যায় বোধ করিলেন। শত্রুহস্তে উৎসাদিত গ্রামের দৃশ্য অতি শোচনীয়। ভস্মাবশেষ গৃহ, পদদলিত শস্যক্ষেত্র, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হতাহত জীবদেহ এবং লুণ্ঠিত-বিত্ত ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগের অশ্রুসিক্ত মুখ দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দর্শন করিয়া তুকারাম সংসারের অনিত্যতা আরও সুস্পষ্টরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ভগবানকে কেবলই বলিতেন; "প্রভো! এই মর্ত্ত্য লোকে বাস আমার যথেষ্টই হইয়াছে, এইবার

আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।” তুকারামের উপদেশ গুণে লোহগ্রামবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই সাংসারিক সুখে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক বিপৎপাতে সে শিক্ষা সম্যক্‌রূপ ফলদায়িনী হইল। পার্থিব সম্পদের অসারত্ব বুঝিয়া, লোহগ্রামের অনেকে, ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য, তুকারামের সঙ্গে দেহুতে আগমন করিলেন।

তুকারামের দেহুতে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরে দোলযাত্রার উৎসব উপস্থিত হইল। সাধারণতঃ দোল-যাত্রা উপলক্ষে অনেক বীভৎস আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তুকারাম, সে সকল রহিত করিয়া, গ্রামস্থ সকলকে কেবলই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিতে বলি-লেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে “হোলির” কুৎসিত আমোদ রহিত হওয়াতে, দেহুগ্রাম সে বার নির্ম্মল ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইল। পূর্ণিমা গত হইলে, প্রতিপদের দিন, তুকারাম সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। সে রাত্রিতে তিনি যে ২৪টী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা “কায়া-ব্রহ্মকরণ” অর্থাৎ “ব্রহ্মে দেহসমর্পণ” নামে পরিচিত। সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রাভাতিক আরতি সমাপনান্তে তিনি, শিষ্যদিগকে উপদেশ দানপূর্ব্বক, হরিনাম ঘোষণা করিতে

করিতে, মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন এবং অবলাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে এস"। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তুকারাম কোন তীর্থে যাইতে হইলে সকলকে বলিতেন যে, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি;" সুতরাং অবলাই সহজেই মনে করিলেন যে, তুকারাম এবারও কোন তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তাঁহার অভ্যাসানুরূপ "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম" বলিতেছেন। সেই জন্য, তিনি, সে কথায় কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া, বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি সসত্বা, গৃহে শিশুসন্তানগুলিকে ফেলিয়া এবং সংসারের ভার ছাড়িয়া, কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে যাইব।" তুকারাম এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম, আর গৃহে ফিরিব না।" ইহার পর আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন;—

"আত্মজন, পরজন, যে হও, সে হও ;
পাণ্ডুরঙ্গ শ্রীচরণে শরণ গে লও ॥
জানায়ো প্রণাম মোর গুরুজনগণে,
শেষ নিবেদন মোর রাখিও স্মরণে ॥
পড়ে যদি মধুভাণ্ডে মক্ষিকা কখন,
সে কি আর উঠিবারে চাহে কদাচন ?

সময় বারেক যদি গত কভু হয়,
সেত আর কোন দিন ফিরিবার নয় ॥
সিন্ধু সনে ভাগীরথী হয় যদি লীন,
ফিরিতে পশ্চাতে সে কি চাহে কোন দিন ?
এই নিবেদন তবে চরণে সবার,
যাইতেছে তুকারাম, ফিরিবে না আর ॥

অনন্তর নিজের পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া, অনুগত শিষ্যদিগকে বলিলেন ;—

"যা ছিল প্রাণের কথা বলেছি সকল,
একটী এখনও বাকী রয়েছে কেবল ॥
চলিলাম আমি আজ অমর-সদনে,
রহিলেন পত্নী মোর মরত ভবনে ॥
জান তিনি গৃহকার্য্যে নহেন চতুরা,
নাহি মুখে মিষ্টবাণী, বড়ই মুখরা ॥
কি বলিব, সাধুগণ ! তোমা সবে আর
মোর অনুরোধে সবে লয়ো তাঁর ভার ॥
বহু উপকারে তাঁর আছি আমি ঋণী।
বস্ত্রে বস্ত্রে বাঁধি তাঁরে করেছি গৃহিণী ॥*

---

* বিবাহের সময় দম্পতী পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সম্বদ্ধ হন। তাঁহাকে বস্ত্রে বস্ত্রে বাঁধিয়াছিলাম, অর্থাৎ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া-

পাণ্ডুরঙ্গ, ঋণ তাঁর কর বিমোচন ;
খুলে দাও উভয়ের দাম্পত্য-বন্ধন ॥
তুকা বলে, দয়াময় হরির কৃপায়,
ঋণ শোধি তুকারাম মুক্তি-পথে ধায় ॥

ইহার পর সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন ;—

চলিনু আপন দেশে, শুন বন্ধুগণ !
"রাম রাম" সবে মোর করহ গ্রহণ + ॥
এই হল শেষ দেখা সকলের সনে,
ভবের সম্বন্ধ-পাশ ছিন্ন এত দিনে ॥
সবার চরণে আমি করি এই নতি,
দীন আমি, কৃপা সবে রেখ মোর প্রতি ॥
যাই আমি, বন্ধুগণ ! যাই নিজ ধাম।
বল সবে "রাম, কৃষ্ণ, বিঠ্‌ঠলের" নাম ॥

ছিলাম, বোধ হয় তুকারামের ইহাই বলা উদ্দেশ্য। আমাদিগের দেশেও বর কন্যার "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

+ "আমার "রাম রাম" গ্রহণ করিও," অর্থাৎ আমার বিদায়কালীন নমস্কার অবগত হইও। "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার প্রথা ভারতবর্ষের অনেক স্থলে প্রচলিত আছে।

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বিঠোবাকে প্রণামানন্তর, তিনি নাম ঘোষণা করিতে করিতে, সেথান হইতে বহির্গত হইলেন। তুকারাম বলিয়াছিলেন যে, "আর আমি প্রত্যাগমন করিব না"; সেই জন্য যদিও কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলিতেন বলিয়া, তিনি যে এবার সত্য সত্যই মহা প্রস্থান করিবেন, তাহা কাহারও প্রত্যয় হয় নাই। তাঁহারা ভাবিলেন, হয়ত তিনি কোন বহুদূরস্থ দুর্গম তীর্থে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেই জন্যই এরূপ কথা বলিতে-ছেন। তাদৃশ সঙ্কট-বহুল সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবার জন্য, তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য রামেশ্বর ভট্টকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইতে বলিলেন। তুকারামের অনুগামিগণ যখন এইরূপ পরা-মর্শ করিতেছিলেন, তুকারাম তখন সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একবারে ইন্দ্রায়নী-তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি তাঁহার অন্তিমপ্রার্থনা সূচক কয়েকটী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। তুকারামের ভক্তিমান চরিতাখ্যায়ক মহীপতি বলেন যে, সেই সকল অভঙ্গ গীত হইবার পর, সহসা দিব্য জ্যোতিতে তাঁহার পার্শ্বচরদিগের

চক্ষু ঝলসিত হইল এবং তাহার পর তাঁহারা নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তুকারাম কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ তুকারামের এইরূপ অন্তর্দ্ধান ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান নাই; কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ দেখিলেন যে, স্বর্গ হইতে দেবগণবেষ্টিত বিমান অবতীর্ণ হইল এবং শঙ্খঘণ্টানিনাদে ও গন্ধর্ব্বগণের নাম ঘোষণায় আকাশ পরিপূর্ণ হইল। তুকারাম দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক, সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন। ভারতের অন্যান্য অনেক সাধু পুরুষের ন্যায় তুকারামেরও তিরোভাব এইরূপ অলৌকিকতায় জড়িত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় ও কি ভাবে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক অনুমান করেন যে, হয় ত যে সময় তুকারামের শিষ্যগণ তাঁহার শেষ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তুকারাম সেই সময় ইন্দ্রায়ণীতে অবতরণপূর্ব্বক "জলসমাধি" গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলসমাধি গ্রহণের প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে যেরূপ প্রচলিত ছিল, তাহাতে তুকারামের ন্যায় বীতরাগ পুরুষের পক্ষে তাহা অবলম্বন করা অসম্ভব নহে। তুকারাম যেখানে

অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে এখনও নির্দ্দেশ করে, ইন্দ্রায়ণীর সে স্থান অতি গভীর এবং শিশুকাদি জল জন্তুতে পরিপূর্ণ। গভীর জলের জন্যই হউক, বা এই সকল জলজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, তুকারামের দেহ আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তুকারাম সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তুকারামের চরিতাখ্যায়ক উপরি উক্তরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তুকারামের তিরোভাব সম্বন্ধে এইরূপ আরও দুই একটী অতিলৌকিক মত প্রচারিত আছে। সে সকলের আলোচনায় কোন লাভ নাই। দেহুতে তুকারামের বংশধরদিগের গৃহে তাঁহার অভঙ্গ সমূহের যে পাণ্ডুলিপি এখনও রক্ষিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহা ইন্দ্রায়ণী হইতে উদ্ধৃত পাণ্ডুলিপি বলিয়া সেখানকার লোকে এখনও বিশ্বাস করেন, তাহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে "১৫৭১ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া তিথির প্রাতে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ (বৈকুণ্ঠ গমন) করিয়াছিলেন।" ইহাতে কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহাই তাঁহার পরলোক গমন সম্বন্ধে অমিশ্র

সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; ইহার অতিরিক্ত কিছু নির্দ্দেশ করিতে হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তুকারামের তিরোভাবের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং অবলাইও, হাহাকার করিতে করিতে, সেখানে উপস্থিত হইলেন। তুকারাম হয়ত জল হইতে পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারেন, বা তীর্থযাত্রা হইতে বিরত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন, এই আশায় সকলেই ইন্দ্রায়ণীর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে অপর সকলেই গৃহে প্রতিগমন করিলেন; কেবল রামেশ্বর ভট্ট প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী ভক্তিমান শিষ্য তাঁহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সে স্থান ত্যাগ করিবনা এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহীপতি বলেন, চতুর্থ দিনে তুকারাম তাঁহাদিগের জন্য স্বর্গ হইতে আপনার ব্যবহৃত একটী বাদ্য ও পরিচ্ছদ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার সংবাদ স্বরূপ কয়েকটী অভঙ্গও প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহারা তুকারাম নিশ্চয়ই পরলোক গমন করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, স্নানশুদ্ধি সমাপনান্তে

বিঠোবাকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।*

তুকারামের তিরোভাবকালে অবলাই সসত্বা ছিলেন। তুকারাম পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার গর্ভে এবার যে সন্তান জন্মিবে তাহার নাম নারায়ণ রাখিও, সে বিশেষ ভক্তিমান হইবে।" তুকারামের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। নারায়ণ সত্য সত্যই পরম ভক্তিমান ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি অভঙ্গ এখনও মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে। তুকারামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে শিবাজী একবার দেহুতে আগমন করিয়াছিলেন। তুকারামের পুত্রদিগকে বিশেষতঃ নারায়ণকে ভক্তিমান ও পিতৃপথাবলম্বী দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য কয়েকখানি গ্রাম জায়-গীর দান করিয়াছিলেন। তুকারামের বংশধরগণ অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছেন।

তুকারামের জীবনের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। সাধারণতঃ সাধুদিগের জীবন যেরূপ ঘটনা-শূন্য হইয়া

---

* এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার দিনই তুকারামের তিরোভাবের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই দিনে এখনও প্রতি বৎসর তুকারামের স্মরণার্থ দেহুতে একটী মেলা হইয়া থাকে।

থাকে, তুকারামের জীবন সেরূপ নহে। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। সুখ, দুঃখের যে অভিজ্ঞতা হইতে মনুষ্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তুকারামের জীবনে তাহা যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি পিতা মাতার পরম আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। সামাজিক রীতি অনুসারে অল্পবয়সে বিবাহ করাতে তরুণ যৌবনেই তাঁহাকে সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিষয় বুদ্ধির তাঁহার অভাব ছিল না। যে কয়বৎসর তিনি পৈত্রিক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্টই উন্নতি হইয়াছিল। সুতরাং পিতা মাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, নবজাত পুত্রের মায়া এবং অর্থের মোহ প্রভৃতি, সকল প্রকার সাংসারিক প্রলোভন, সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাকে শক্ত বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিল। পৃথিবীর কোটী কোটী জীবের ন্যায় তিনিও বিষয়ের সেবায় নিমগ্ন থাকিবেন, এ অবস্থায় ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছিলেন এবং শচীমাতার সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার সাভিলাষ দৃষ্টি তুকারামেরও উপর নিপতিত হইয়াছিল। পৃথিবীর শোক, তাপ, হিংসা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া

শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি তুকারামকে আপনার সৈনিকরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। পিতামাতার আকর্ষণ ও পত্নীর বাহুপাশ দূরে থাকুক, লৌহের শৃঙ্খলে পদদ্বয় আবদ্ধ থাকিলেও, ভগবানের চিহ্নিত সৈনিক তুকারামের সাধ্য ছিলনা যে, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন। বিশ্বরাজের রণভেরীর আহ্বানে তিনি সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। তাঁহার বন্ধনও একে একে ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার পিতা, মাতা, এবং ভ্রাতৃজায়া উপর্য্যুপরি পরলোক গমন করিলেন। ভ্রাতা সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্নেহাস্পদ পুত্র শৈশব অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই পিতামাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। বণিকের পক্ষে যাহা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, তুকারামের সেই জাতীয় ব্যবসায়েও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তুকারাম প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলেন না। অর্থ, পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব, স্বজাতীয়গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা, সকলই ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার রোগজীর্ণা পত্নী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবানের এমনই অদ্ভুত কৌশল যে, যাহা একের পক্ষে বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমৃত স্বরূপ হইয়া থাকে। তুকারাম যে অবস্থায়

পতিত হইয়াছিলেন, অনেকের পক্ষে নাস্তিকতাই তাহার পরিণাম। কিন্তু শিশু যেমন মাতার নিকট নিগৃহীত হইলেও মাতাকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করে, তুকারামও তেমনই, সেই বিশ্বজননীর নিকট নিগৃহীত হইয়া, তাঁহাকেই অবলম্বন করিলেন।

স্বর্ণকার স্বর্ণের শ্যামিকা দূর করিবার জন্য তাহা পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ করে; ভগবানও তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণের নির্ম্মলত্ব প্রতিপাদনের জন্য, তাঁহাদিগকে সংসারের প্রচণ্ড অনলে নিক্ষেপ করেন। সেই অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারাই ভগবদ্ভক্তদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতা সাধিত হয়। তুকারামের সমস্ত জীবনই এক সুদীর্ঘ অগ্নি-পরীক্ষা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। সংসারের অসারত্ব বুঝিয়া তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে মুক্তিমার্গ গমনে উদ্যত দেখিয়া আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ চতুর্দ্দিক হইতে নিবারণের জন্য ধাবিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে উন্মত্ত, কেহ নির্ব্বোধ এবং কেহবা শঠ ভাবিয়া তিরস্কার করিলেন। তুকারাম যখন তাহাতে বিচলিত হইলেন না, তখন বিদ্রূপ, কটূক্তি ও তাহার পর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। কণ্টকের যষ্টিতে তাঁহার

সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং তাঁহার সর্ব্বস্বধন, বিঠোবার চরণে উৎসৃষ্ট অভঙ্গগুলি, ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষিপ্ত হইল। গৃহে শান্তি থাকিলে মনুষ্য বাহিরের এ সকল অত্যাচার কোনরূপে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু তুকারামের গৃহে শান্তির কণামাত্রও ছিল না। এক রজ্জুতে বদ্ধ, বিপরীতমার্গগমনেচ্ছু, পশুদ্বয়ের ন্যায় তিনি ও তাঁহার পত্নী বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের কণ্ঠ বেদনারই কারণ হইয়াছিলেন।* তুকারাম যখন কোনরূপে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন সাধুজনের পক্ষে যে পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, তাহা উপস্থিত হইল।

---

* তুকারামের সাংসারিক অশান্তির বিষয় আমরা যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। অবলাইয়ের বাক্যবাণে প্রথম প্রথম তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অবলাই পতিকে কেবল তিরস্কার করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না; মহীপতি বলেন যে, একবার বীতক্রোধ তুকারাম কতকগুলি ইক্ষু দরিদ্র বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, অবলাই তাঁহার পৃষ্ঠে একগাছি ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন। বীতক্রোধ তুকারাম তাহাতে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন; যে, "অবলাইয়ের আমার প্রতি এতই ভালবাসা যে, আমাদিগের দুই জনের জন্য ইক্ষুটীকে দুই খণ্ড করিয়া লইলেন।" সত্য হইলে তুকারাম সহিষ্ণুতায় সক্রেটিসকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

পুষ্প বিকসিত হইলে মধুমক্ষিকাগণ দলে দলে আসিয়া, তাহার মধুলুণ্ঠন করিতে থাকে, শেষ, বিনিময়ে আপনাদিগের পদরেণু রাখিয়া, তাহাকে কলুষিত করিয়া যায়। সাধুপুরুষদিগেরও সদ্গুণের কথা শুনিলে, মক্ষিকাবৃত্ত লোক দলে দলে ধাবিত হয়, এবং অতিরিক্ত প্রশংসা দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আত্মাভিমান উৎপাদন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে বিমলিন করিয়া যায়। তুকারামের নাম সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার পর হইতেই তাঁহার নিকট লোকসমাগম আরব্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছত্রপতি শিবাজী হইতে পুত্রহীনা, দরিদ্রা বিধবা পর্য্যন্ত, অনেকেই তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। শিষ্য, সেবক ও অনুরক্ত জনের সংখ্যা ছিল না। অর্থের এবং প্রশংসার প্রলোভন অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু তুকারাম তাহাতে বিমুগ্ধ হন নাই। প্রশংসার মাদকতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং লক্ষপতির সম্পদ উপেক্ষা পূর্ব্বক, ভিক্ষুকের জীর্ণকন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ, প্রশংসায় অবিচলিত এবং ঐশ্বর্য্যে অনাকৃষ্ট থাকিয়া, তিনি ভগবানের নামামৃত স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে

ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে আদর্শ সকলের পক্ষে উপযোগী বা স্পৃহনীয় না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার বিনয়, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তি মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে অনুকরণীয়। আত্মসংযম, জীবে দয়া এবং অহেতুকী ভক্তি প্রভৃতি প্রকৃত সাধুর যে সকল লক্ষণ, তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি আপনাকে তৃণাদপি নীচ বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ঘোর অত্যাচারীকেও প্রেমালিঙ্গন দানে বশীভূত করিয়া, হরিনামামৃত বিতরণে কৃতার্থ করিতেন। বহিরঙ্গ ধর্ম্ম দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে দেশগত, ব্যক্তিগত, বা কালগত কোন পার্থক্য নাই। সকল দেশীয় সকল সম্প্রদায়স্থ এবং সার্ব্বসাময়িক সাধু-গণকেই তাহাতে সমতুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে তুকারাম যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, যে কোন দেশীয় সাধুপুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরবজনক। ভেদবুদ্ধি-বিমূঢ় মনুষ্যসমাজ, সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হইয়া, প্রকৃত সাধুপুরুষের সমাদর করিতে শিক্ষা করিলে, তুকারাম সর্ব্ব-দেশীয় ও সর্ব্বজাতীয় "সাধু" রূপেই পরিগণিত হইবেন।

তুকারামের কবিতার বিশেষত্ব এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয় কোন লেখক এইরূপ বলিয়াছেন:—"অকৃত্রিমতা, সরলতা ও স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তির জন্যই তুকারামের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব। শব্দালঙ্কার দ্বারা কবিতাকে সুশোভিত করিবার চেষ্টা তাহাতে ক্বচিৎ লক্ষিত হয়। কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য হইতে প্রকৃত ধর্ম্মের উপর একটী আবরণ পতিত হইয়া থাকে; সেই আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া মহারাষ্ট্রবাসীদিগকে সাত্ত্বিকী ভক্তির মাধুর্য্য প্রদর্শন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাও বহু পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তুকারাম বলেন যে, সপ্রেম ভক্তিই ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত উপায়। বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এবং মনকে বিষয়বাসনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, তাঁহার স্মরণাপন্ন হওয়াই প্রকৃত মুক্তিমার্গ। সেই প্রকৃত মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আড়ম্বর-বহুল কর্ম্ম-মার্গ অবলম্বন করিলে মুক্তি দুষ্প্রাপ্য হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই সনাতন মত বিলুপ্তপ্রায় দর্শন করিয়া, তুকারাম তাহা পুনঃস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের হীনতা, পার্থিব সুখের ক্ষণিকত্ব, ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য চিরসুখে জীবের ঔদাসীন্য, পাপাচরণে মানবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি, মানবীয় দৌর্ব্বল্য ও পরতন্ত্রতা

প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অভঙ্গ গুলি অতি মর্ম্মস্পর্শী। প্রকৃত সাধুর যে সকল লক্ষণ, তাহা তুকারামে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইত। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিলেও, স্বার্থত্যাগে ও কৃচ্ছ্রসাধনে, তিনি অরণ্যচারীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অহঙ্কার, ঈর্ষা, ও অভিমান তাঁহার আদৌ ছিল না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ এই ছিল যে, তিনি লোককে মুখে যাহা উপদেশ দিতেন, নিজেও কার্য্যে তাহা প্রতিপালন করিতেন।"

তুকারাম যদিও বহুস্থলে বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, জাতিধর্ম্মানুযায়ী আচরণ করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও স্বধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তথাপি হরিসংকীর্ত্তন ও অহেতুকী ভক্তিকেই তিনি সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন, এবং তাহাই প্রচারের জন্য তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন এ কথাও বলিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে জাতিভেদাদি কোন কৃত্রিম বাধা নাই, ইহাই তুকারামের মত। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব যে জাতি হউননা কেন, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী ; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, "আত্মস্থিতি" প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

তুকারাম, স্বভাবতঃ নিরীহ ও ক্ষমা-গুণাবলম্বী হইলেও, দুষ্ক্রিয়ার ও অসদাচারের প্রতি ভ্রূকুটী করিতে পারাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহার অনেক গুলি অভঙ্গে দ্যূত-ক্রীড়া, লাম্পট্য, বৃদ্ধবয়সে বিবাহ, সাধুনিন্দা, কন্যা-বিক্রয় প্রভৃতি সামাজিক দুষ্ক্রিয়ার বিরূদ্ধে অতি তীব্র তিরস্কার লক্ষিত হয়। তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে এক দল দাম্ভিক, ধর্ম্মব্যবসায়ী, ভাক্ত সাধু বর্ত্তমান ছিল। ইহারা শীষ্যশাখা বিস্তার, মঠাদি সংস্থাপন ও গুরু-পরম্পরা বর্দ্ধন দ্বারা বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছিল। লোককে কপট ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতারিত করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তুকারাম এই শ্রেণীর লোককে অতি কঠোর ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন। প্রকৃত সাধুর যে লক্ষণ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিম্নানুবাদিত অভঙ্গে তাহা ব্যক্ত হইবে ;—

বচন মধুর যাঁর নির্ম্মল হৃদয়,
কণ্ঠদেশে যদি তাঁর মাল্য নাহি রয়॥
আত্মারামে অন্তরেতে সদা রতি যাঁর,
শিরে তাঁর যদি নাহি রহে জটাভার॥
ক্লীব যিনি ব্যবহারে পরনারী প্রতি,
অঙ্গে তাঁর লিপ্ত যদি না থাকে বিভূতি॥

অন্ধ যিনি পরদ্রব্য করিতে দর্শন,
মূক যিনি পরনিন্দা করিতে রটন ॥
তুকা বলে, এই সার কহিনু নিশ্চয়,
তিনিই প্রকৃত সাধু নাহিক সংশয় ॥

তুকারামের অবলম্বিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। যদিও তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়া যান নাই, কিন্তু এক বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বদেশে এক নূতন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের দুরভিগম্যতা দূর করিয়া, তিনি তাহা সাধারণের সুপ্রাপ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আচণ্ডাল সকলেই যে ভক্তিগুণে মুক্তিলাভ করিতে পারেন এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে যে বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, তাহা তিনি লোকের প্রতীত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহার স্বদেশীয়গণ ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, প্রকৃত সাধুতা কেবলই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র সম্পত্তি নহে; অন্ধকার আকরে রত্নের ন্যায় নীচকুলেও প্রকৃত সাধু পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। তুকারাম আজীবন স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে এবং শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার অনেক-

গুলি অভঙ্গে তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার অভঙ্গ সমূহে নিম্নলিখিত ভাব গুলি পরিস্ফুট হইবে।

১ম। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল অবস্থাতেই শ্রীভগবানকে ভক্তি করিবে।

২য়। ত্রাতা, পাতা ও শরণ্যরূপে তাঁহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবে।

৩য়। তিনি কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য; বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না।

৪র্থ। জীবের প্রতি অনুকম্পা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, এবং আত্মায় নিরন্তর ভগবানের আবির্ভাব অনুভূতি, এই সকলই প্রকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ। ভস্মলেপন বা জটাধারণ ধর্ম্মের অতি নিকৃষ্ট অংশমাত্র।

৫ম। দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ভগবানের কৃপার অধিকারী। জাতি বা বংশের সঙ্গে ভগবৎ-কৃপার সম্বন্ধ নাই।

৬ষ্ঠ। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং অতি মধুর। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি।

ইহাই তুকারামের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এবং ইহা দ্বারাই তিনি মহারাষ্ট্র দেশের আবাল, বৃদ্ধ, সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ যদিও ধর্ম্মের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবানের সহিত জীবের নৈকট্য সংস্থাপন সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য যে ধর্ম্মে যতই সংসিদ্ধ হয়, সে ধর্ম্ম ততই উচ্চ। এই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য ভগবানকে কেহ রাজা, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ সখা, কেহ বা প্রিয়তম নায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। ভগবান কাহারও কিছু নহেন, অথচ তিনি সকলেরই সকল। যিনি যে ভাবে তাঁহাকে আরাধনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। গীতায় যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।" নায়ক ভাবে ভগবানকে আরাধনা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ। তুকারাম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ ছিল না। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যে পরকীয় নায়ক-নায়িকা-ভাব কল্পনা করেন নাই। ভগবানকে প্রাণারাম পতিরূপে তিনি অনেক স্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহাকে পিতা,

মাতা, সখা, শরণ্য ও আশ্রয়দাতারূপে ভজনা করিতেও বিস্মৃত হন নাই। ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবানে পরকীয়-নায়ক ভাব আরোপ করিলে ধর্ম্মের বিকৃতি করা হয়। ওতপ্রোত ভাবে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা হইতেই এই নায়ক নায়িকা-ভাবের উৎপত্তি। কিন্তু জীবের বর্ত্তমান অপূর্ণ ও কলুষিত অবস্থায় সেই পূর্ণস্বরূপ নিষ্পাপ পুরুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং প্রাণারাম পতি ও সখারূপে ভজনার সঙ্গে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব-মূলক রাজ-ভাব ও পিতৃভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে তুকারামের আদর্শই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

জীবের ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ যাহাই হউক, সে সম্বন্ধ যে অতি মধুর, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই, এবং সেই মধুর সম্বন্ধ মধুরতর করাই যোগ, ধ্যান ও আরাধনার উদ্দেশ্য। ভক্তির ও প্রেমের দ্বারাই ভগবানের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ মধুরতর হইয়া থাকে। ভক্তি-সূত্রকারগণ "ঈশ্বরে পরানুরক্তিকে" ভক্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; আত্যন্তিক অনুরাগের অপর নাম প্রেম। প্রেম এবং ভক্তি পরস্পরের রূপান্তর হই-

লেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভক্তি ভগবানের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হইতে এবং প্রেম তাঁহার মাধুর্য্য-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। ভক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলে, প্রেম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা দেয়। ভক্তি তাঁহার মহিমা ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার স্তুতি করে, প্রেম তাঁহাকে নিজ জন ভাবিয়া সুখ, দুঃখ সকল কথা নিবেদন করে। এইজন্য ভক্তি অপেক্ষা প্রেম উচ্চতর এবং ভক্ত অপেক্ষা প্রেমিক ভগবানের প্রিয়। তুকারাম প্রেমিক ছিলেন। তিনি ভগবানকে নিতান্তই নিজ জন অথবা আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে পত্নী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন কাহারও, এবং ধন, মান, যশঃ কিছুরই স্থান ছিল না; সকলকে অপসারিত করিয়া সেই সর্ব্বময়কে তিনি তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুত্র যেমন মাতার নিকট, সতী যেমন পতির নিকট এবং সখা যেমন সখার নিকট অব্যাজে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন, তিনিও তেমনি সেই প্রাণারাম প্রভুর নিকট সুখ, দুঃখ সকল কথা নিবেদন করিতেন। মুম্বাজী গোঁসাই যখন তাঁহাকে প্রহার করিলেন, রামেশ্বর ভট্ট যখন তাঁহার কবিতাগুলি ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন, তুকারাম তখন কাহাকেও কোন

না মিটিতে মন-সাধ,   বৃথা ঘটাইয়া বাদ,
উচিৎ কি বল নির্যাতন ?
সন্তানের যত ভার   মাতা বিনা বল আর
কেবা পারে করিতে গ্রহণ ?
তুকা বলে, ভগবান !   তুমি সর্ব্ব শক্তিমান,
কিবা তব অসাধ্য এ ভবে
আমি যে বাসনা করি   সেত অতি তুচ্ছ, হরি !
কেন বল না পূরিছ তবে ?

উত্তরকালে তুকারাম প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শূদ্র ও সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া প্রথমাবস্থায় তাঁহাকে বড়ই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। বিঠোবার নিকট এই অবস্থায় অভিব্যক্ত কয়েকটী কবিতা নিম্নে অনুবাদিত হইতেছে ;—

জন্মেছি কুনবী কুলে জান হরি ! তুমি ;
দেবভাষা সংস্কৃতের কিবা বুঝি আমি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, মোর কাছে আসি,
জিজ্ঞাসেন শাস্ত্র-মর্ম্ম করুণা প্রকাশি॥
মূঢ় আমি; কি উত্তর দিব, প্রভো ! তায় ?
না সরে বচন মোর, জিহ্বা জড় প্রায়॥

শাশ্বত এ বিশ্ব, তার সম্ভব কেমন,
কিছুই বুঝিতে নারি, বিমোহিত মন ॥
বুধ-জনোচিত, দেব ! নহে মোর বাণী।
তুকা বলে কৃপা মোরে কর চক্রপাণি ॥

ভালই সে জন্মেছিনু হয়ে শূদ্র জাতি।
দম্ভ হ'তে তাই দেব ! লভেছি নিষ্কৃতি ॥
বেদ পাঠে নাহি মোর ছিল অধিকার।
তাই বেসেছিনু ভাল চরণ তোমার ॥
তুকা-বলে জাতি হীন, অতি দীন আমি।
জনক, জননী মোর সব প্রভো তুমি ॥

ভালই কুন্‌বী কুলে লভিনু জনম।*
তা না হ'লে দম্ভে মোর ঘটিত মরণ ॥
ভাল করিয়াছ প্রভো ! ঘুচায়েছ দায়।
আনন্দেতে নাচে তুকা, লোটে তব পায় ॥

জন্মিতাম যদি আমি ব্রাহ্মণ হইয়া।
কর্ম্ম কাণ্ড পশ্চাতেতে রহিত লাগিয়া ॥
জন্মেছি যে হীন কুলে ভাল হল তাই,
স্নান, সন্ধ্যা, জাতি, কুল কোন চিন্তা নাই ॥

---

* কুন্‌বী চাষা বা ব্যবসায়ী।

তুকা বলে কি বলিব, আমি হীন অতি,
কৃপা তবে মোর প্রতি করগো শ্রীপতি॥

পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ পদার্থও উত্তপ্ত হয়। মধুর প্রকৃতি হইলেও, "নীচজাতীয় ও শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য" বারম্বার এইরূপ অভিহিত হওয়াতে, ক্বচিৎ তুকারামেরও হৃদয় সন্তপ্ত হইত। শেষোদ্ধৃত কবিতা দুইটী তাহারই নিদর্শন। তাদৃশ আরও একটী কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

"বিদ্যা, বুদ্ধি যদি কিছু থাকিত আমার,
তাহলে ঘটিত ঘোর বিপদ অপার॥
সাধুগণ সেবা হ'তে হ'তাম বঞ্চিত।
ছুটিতাম মৃত্যু-পথে গর্ব্বে হয়ে স্ফীত॥
তুকা বলে, বড় ব'লে করে যারা মান।
নরক তাদের ভাগ্যে ইথে নাহি আন॥

এই সঙ্গে তুকারামের ধর্ম্মভাব প্রকাশক কয়েকটী কবিতার গদ্যানুবাদও প্রদত্ত হইতেছে;—

যিনি দেহ, অর্থ, প্রাণ, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই হরিকে জয় করিতে সমর্থ। মোহ, মমতা, চিন্তা, উদ্বেগ যাঁহার নাই, বিষয়-বাসনাকে যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, লোকলজ্জা, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যকে যিনি

নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, চক্রপাণি তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার জন্য শান্তি, ক্ষমা ও দয়া প্রভৃতি সখীকে প্রেরণ করেন। অতএব তুকা বলে, জাতি ও পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সাধু পুরুষদিগের শরণাগত হও।

কণ্ঠ হইতে হরিনাম উচ্চারিত হইবামাত্র হরি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবেন, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিবে; সর্ব্বদা এইরূপ একাগ্র ধ্যান করিবে। ব্রহ্মাদি যাঁহাকে ধ্যানে খুঁজিয়া পান না, তিনি সংকীর্ত্তনের সাহায্যে সুপ্রাপ্য হন। তুকা বলে, "সর্ব্বদা মনে মনে হরির রূপ দর্শন করিবে"—আমার পূর্ব্বোক্ত উক্তির ইহাই সার মর্ম্ম।

সাধক সর্ব্বদা উদাসীন থাকিবেন; অন্তরে, বাহিরে কোন প্রকার উপাধি রাখিবেন না। লোলুপতা ও নিদ্রা জয় করিবেন এবং পরিমিত ভোজন করিবেন। প্রাণ যাইলেও একাকী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিবেন না। সজ্জনের সঙ্গ ও হরিনাম উচ্চারণ এবং সংকীর্ত্তন ঘোষণা অহর্নিশি করিবেন। তুকা বলে, যে ব্যক্তি এইরূপ সাধন করিয়া কালক্ষেপণ করে, গুরুর কৃপায় সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে।

অন্তরে যে জ্যোতিঃ আচ্ছাদিত আছে, তাহা যখন দীপ্তিমান হইয়া প্রকাশিত হয়, তখনকার আনন্দ ব্রহ্মাণ্ডে ধরে না। সে আনন্দের ও সুখের উপমা কি দিব? (তখন) ইষ্টকোপরি এই যে বিঠোবা রহিয়াছেন, ইনি একাধারে ভক্তিসাগর-মন্থনের (আকাঙ্ক্ষিত) ফলস্বরূপ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সার-সঞ্চয়বৎ প্রতীয়মান হন। তুকা বলে,পণ্ঢরপুর আমাদিগের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে।"

বঙ্গদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশেও ধর্ম্ম-সাহিত্য হইতে জাতীয় সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই ধর্ম্মসাহিত্য-লেখকদিগের মধ্যে তুকারামের নাম অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রায় এগার হাজার অভঙ্গ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তুকারাম প্রথমে কিরূপ অবস্থায় অভঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ভগবৎ-প্রসাদে এবং অভ্যাসগুণে অভঙ্গ রচনায় তাঁহার ক্রমশঃ এমনি দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, পরে গদ্যের ন্যায় অনায়াসে তিনি অভঙ্গ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এই-জন্যই তিনি রোগ, বিপদ, সকল অবস্থাতেই অভঙ্গের দ্বারা নিজের মানসিক ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক অভঙ্গ লুপ্ত হইয়াছে, আবার অন্যের

রচিত কোন কোন অভঙ্গ তাঁহার নামে আরোপিত হইয়াছে। অভঙ্গ ব্যতীত আরও যে সকল গ্রন্থ তাঁহার রচনা বলিয়া এক্ষণে মহারাষ্ট্র দেশে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল;—

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা।	
১। ভগবদ্‌গীতার ১৮শ অধ্যায়ের অনুবাদ—		
২। নৃসিংহাবতার চরিত্র।	৩৬	শ্লোক।
৩। প্রহ্লাদ চরিত্র।	৪৮	„
৪। বামনাবতার।	১৩৮	„
৫। পরশুরাম চরিত।	১২	„
৬। শ্রীরাম জন্ম কথা।	৬৭	„
৭। শ্রীরাম চরিত।	৫২	„
৮। সীতাশোক (অশোক বনে)।	৬	„
৯। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম।	১৬০	„
১০। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র(গোষ্ঠ ও বাল্যলীলা)।	৫১৪	„
১১। কল্কী অবতার।	১৩	„
১২। কাল যবন বধ।	৬১	„
১৩। রুক্মাঙ্গদ চরিত্র।	৮১	„
১৪। অম্বরীষ চরিত্র।	১২৩	„
১৫। ভানুদাস চরিত্র।	৮৬	„

বিষয়।		শ্লোক সংখ্যা।
১৬। শ্রীয়াল চরিত্র।	৫২	”
১৭। দ্রৌপদীর কৃষ্ণস্তুতি (দুর্ব্বাসার ছলনা কালে)	২৫	”
১৮। ময়ূর-ধ্বজ চরিত্র।	২১	”
১৯। সুদাম চরিত।	৫৯	”
২০। দামাজীপন্তের চরিত।	৩৩	”
২১। চোখামেলা চরিত।	৭২	”
২২। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ।	১০০	”
২৩। সাবন্তমালী চরিত্র।	১৬	”
২৪। হরিপাল চরিত্র।	৩৬	”
২৫। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাল্যলীলা প্রায় ৮ শত শোক।		
২৬। হিন্দী কবিতা।	১১৩	”

তুকারামের কবিতার বিশেষত্ব এই যে, তাহা একদিকে যেমন ভক্তিভাবপূর্ণ, অপর দিকে তেমনি সুনীতির পরিপোষক। তাঁহার অভঙ্গের উচ্চ আদর্শ ও নীতিতে মুগ্ধ হইয়া বোম্বাইয়ের শিক্ষা বিভাগের অন্যতম ডিরেক্টর সার আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট বলিয়াছিলেন; “তুকারামের অভঙ্গ যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের নিকট খ্রীষ্টীয় নীতির প্রশংসা করা বৃথা”। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে মাদকতাপূর্ণ, ইন্দ্রিয়-বিকারোৎপাদক ভাবের সম্মিলনের

জন্য ভারতবর্ষের কোন কোন বৈষ্ণব কবির রচনা অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু তুকারামের কবিতায় এরূপ ভাব দৃষ্ট হয় না। তাঁহার কবিতা ভাগীরথীর সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র ও তৃপ্তিকর। তাহা পান করিলে তৃষ্ণা দূরীভূত হয়, অথচ তাহাতে উত্তেজনা বা অবসাদ উৎপাদন করে না। মৌলিক চরিত্র উদ্ভাবনে বা কল্পনা লীলায় তুকারাম ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নহেন; কিন্তু সুনীতি ও সদ্ভাব-প্রচারক ভারতীয় কবিগণের মধ্যে তিনি যে একজন অগ্রগণ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুকারাম-চরিত সম্পূর্ণ হইল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তুকারামকে আদর্শ রূপে সংস্থাপিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। অতীতকালের প্রস্তরীভূত জীবকে প্রাণ দান করিয়া পৃথিবীতে পুনরানয়নের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, পূর্ব্বকালীন সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগকে অনুকরণ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ। তবে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় তাঁহাদিগের সদ্গুণ আমরা যে পরিমাণে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিব, ততই আমাদিগের মঙ্গল। বৈরাগ্য, বিনয় এবং ভগবৎপ্রেম এই তিনটীই তুকারামের চরিত্রের সারাংশ। এই তিন গুণেরই জন্য তিনি চিরকাল তাঁহার স্বদেশবাসিগণের আদর্শ

স্বরূপ থাকিবেন। তুকারামের কার্য্যাবলী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যখন মহারাষ্ট্রদেশ আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাবল্যে শুষ্ক-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তুকারাম সেই সময় সেখানে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত-গণ যখন তর্কবলে "সপ্ত ব্রহ্ম-স্থাপন" ও "সপ্ত-ব্রহ্ম নিরসন" করিতেন, বিদ্যাভিমান শূন্য তুকারাম, সেই সময় সেখানে আবির্ভূত হইয়া, বিনীত ভাবে ভক্তি-কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! শাস্ত্রজ্ঞান, তর্ক-শক্তি বা বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার কথা শুনিলে বিষয়ীর বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হইত, জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব দূরীভূত হইত এবং শুষ্কহৃদয় তার্কিক ভক্তির অমৃতাশ্রুতে অভিষিক্ত হইত। একমাত্র ভক্তিবলেই তিনি লোকের হৃদয় বিগলিত করিতেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তুকারামের তাহা ছিল না, সেই জন্য পৃথিবীর অল্প লোকেই তাঁহার নাম অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তি, নির্ভরশীলতা, জীবে দয়া, বৈরাগ্য এবং বিনয় প্রভৃতি গুণ পৃথিবীর যে কোন সাধু মহাত্মারই পক্ষে স্পৃহনীয়। যে সকল ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী আপনাদিগের সত্তা কোন বৃহৎ

তরঙ্গিণীতে বিলুপ্ত করে, তাহাদিগের নাম পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কৃষকের শস্য-ক্ষেত্রের শ্যামলতা সম্পাদন করিয়া এবং তৃষ্ণার্ত্তকে অমৃতবারিতে পরিতৃপ্ত করিয়া তাহারা ধীর গমনে প্রবাহিত হইতে থাকে। তুকারামের অস্তিত্ব ভারতের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অস্তিত্বে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্য বিলুপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর কত তাপ-ক্লান্ত পথিক, কত শুষ্ককণ্ঠ নরনারী এখনও তাঁহার ভক্তি-রস-পূর্ণ কবিতায় তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। হিন্দুজাতি পুরুষকারে ও বলবীর্য্যে জগতের কোন কোন জাতি অপেক্ষা এক্ষণে নিকৃষ্ট হইলেও দয়া, সহৃদয়তা, এবং ভক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণে জগতের কোন জাতি হইতে নিকৃষ্ট নহেন। লুণ্ঠিতবিত্ত ও অধঃপতিত হইলেও এই সকল গুণই এক্ষণে হিন্দুজাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে এবং ইহাতেই হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব। যাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তগুণে হিন্দুজাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতিগত এই সকল গুণ এখনও রক্ষা করিতে পারিতেছেন, তুকারাম তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব রক্ষা করা যদি গৌরবজনক ও প্রার্থনীয় হয়, তবে তুকারাম অবশ্যই হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তি-কথায় লোকের অনুরাগ বিলুপ্ত না হইলে, তাঁহার নাম ভারত-ভূমি হইতে কখনও অন্তর্হিত হইবে না।

সম্পূর্ণ।

বাসন্তী।

স্বপ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালেজের 'আউট' হইয়া সকলেই একটা না একটা কাজ লইয়া দিন কাটায়, যথাসময়ে এম, এর খবর বাহির হইল, আমার সহাধ্যায়ীরা কেহ 'পিনালকোড' ও 'এভিডেন্স এক্টের' ধারায় মনঃসংযোগ করিলেন, কেহ মাষ্টারী আরম্ভ করিলেন, আমার কিন্তু দিনপাতের কোনই উপলক্ষ্য নাই, নির্দ্ধারিত কাজের অভাবে আমি কখন কিছু কাল কাব্য আলোচনা করি, কোন দিন গ্রামের 'আর্য্য রঙ্গভূমির' আড্ডায় গিয়া ঐকতানিক বাদ্য এবং সঙ্গীত উপভোগ করা হয়, কখন বা বন্ধুবর্গের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া রহস্যালাপ চলে, কিন্তু সময় কিছুতেই কাটিতে চায় না।

তথাপি এমনি করিয়া কিছু দিন কাটিয়া গেল। আমি যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রি। উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি পরি- ব্যাপ্ত; ভাবিলাম আজ আর কোথাও বাহির হইব না,

এমন রাত্রিটা বাজেখরচ করা কখন বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে; তাই আমার শয়ন-কক্ষের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সেই হাস্যময়ী প্রকৃতির মধুর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আমার শয্যাপ্রান্তে শুভ্র জ্যোৎস্না রাশি আসিয়া পড়িয়াছিল, মৃদু নৈশ সমীরণ সদ্যপ্রস্ফুট আম্র-মুকুলের সৌরভে আমায় ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, এবং আমার ইচ্ছা করিতেছিল এমনি রাতে— কি ইচ্ছা করিতেছিল তাহা আর বলিয়া কাজ নাই— আমি পড়িয়া পড়িয়া কেবলই ইচ্ছা করিতেছিলাম, এমন সময় কে যেন সহসা সেই স্ফুট-জ্যোৎস্না-পুলকিত অদূরবর্ত্তী নদী-সৈকত হইতে কোমল, পুষ্পগন্ধ-সমাকুল বায়ুস্তর কম্পিত ও নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুললিত উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল ঃ—

" বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম বনে
তারে কি পড়েছে মনে
বকুল তলে?

এখন ফিরাবে আর
কিসের ছলে!

মধুনিশি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বার বার
সে জন ফিরে না আর
যে গেছে চলে!

ছিল তিথি অনুকূল
সুধু নিমেষের ভুল
চিরদিন তৃষাকুল
পরাণ জ্বলে।

এখন ফিরাবে আর
কিসের ছলে!"

সঙ্গীতের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইল, ভাবিলাম আমার এ হৃদয়ও চিরদিন তৃষাকুল বটে, কিন্তু অনুকূল তিথিতে কেহ ত আমার প্রেমের আতিথ্য স্বীকার করে নাই, শুষ্ক পুঁথির বোঝা টানিয়াই জীবনের অমূল্য পঁচিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছি, তবে কাহাকে কিসের ছলে ফিরাইব? যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ সঙ্গীত, না জানি তাহার হৃদয়ে কত ব্যথা; সুগভীর প্রেমের সন্ধান পাইয়াও হয় ত না বুঝিয়া নয়নজলে যাহাকে সে বিদায় করিয়াছে, এখন ছল করিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা! তখনই আবার নিজের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিলাম, দেখিলাম তাহা চিররুদ্ধ, প্রেম-জ্যোতিহীন, মেঘমণ্ডিত অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় এবং

শান্তিশূন্য। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিলাম; কতক্ষণ চিন্তা করিলাম, কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম কিছু মনে নাই।

স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নই বটে, কিন্তু এত দিন পরে আজ তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; চন্দ্রকর-বিধৌত, সেই পরম শোভাময়ী বাসন্তী নিশীথে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মধুর স্বপ্নচিত্র চিরদিন আমার স্মৃতিপটে অম্লানভাবে অঙ্কিত থাকিবে, যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখ খানি স্বপ্নের মধ্যে আমার নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আমি কখন বিস্মৃত হইব না, সেই উজ্জ্বল, প্রশান্ত, প্রফুল্ল প্রেমপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ধ্রুবতারার ন্যায় আমার জীবনসমুদ্রে শুভ্র মঙ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিবে।

আমি দেখিলাম একটি সুদীর্ঘ সরোবর, নীল জল তাহার কুলে কুলে ভরিয়া রহিয়াছে; বায়ুপ্রবাহ শূন্য নীল আকাশের নীচে তাহা একখানি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ এবং অচঞ্চল। সরোবরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পকানন; গোলাপ, যুঁই, চামেলী, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি কত রকমের ফুলের গাছ তাহার সংখ্যা নাই; এই সমস্ত ফুলের গাছ বেষ্টন করিয়া শতপ্রকার বিভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন আকারের পত্রবিশিষ্ট ক্রোটনের গাছ, অশোক, চম্পক, বকুল, দেবদারু এবং ঝাউ বৃক্ষে এই উপবন শোভিত, তাহাদের সুদীর্ঘ উন্নত শির

আকাশপটে চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। সরোবরের এক দিকে একটি বিস্তৃত বাঁধা ঘাট, উপরে সুরঞ্জিত চাঁদনী, এবং তাহার অদূরে এক সুদৃশ্য শুভ্র অট্টালিকা। শুক্ল যামিনীর পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বাকাশ হইতে তাহার কমনীয় রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিতেছিল; এবং সেই রজতকিরণে মনোহর প্রমোদ ভবন সরোবরজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। জ্যোৎস্না স্নাত পুষ্পকানন ও সুবৃহৎ উদ্যান আমার মুগ্ধ নয়ন সমক্ষে একখানি রহস্যময় আলেখ্যবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

আমার বোধ হইল এই সরোবরের নীল জলে আমি একখানি ক্ষুদ্র, সুন্দর তরণীর উপর বসিয়াছিলাম, আমার চারি দিকে প্রস্ফুটিত কুসুম রাশি ঝরিয়া পড়িতেছিল, এবং পূর্ণ চন্দ্রের সমুজ্জ্বল কিরণে উন্নত আকাশ ও উন্মুক্ত ধরাতল বিধৌত হইতেছিল। আমার পার্শ্বদেশে একটি লাবণ্যবতী কিশোরী, তাহার সুন্দর, সরল, সুকোমল মুখশ্রীতে প্রেম ও প্রতিভা সুপরিস্ফুট এবং তাহার চঞ্চল উজ্জ্বল চক্ষে লজ্জা ও কৌতুক-হাস্য তরঙ্গায়িত হইতেছিল। আমি বিস্ময়ের সহিত তাহার সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম, বালিকা সহসা তাহার নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রেমপূর্ণ, শান্ত চক্ষুদ্বয় আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মৃদুহাস্য বিজড়িত স্নেহ কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল “কি দেখিতেছ?” আমি তাহার আলুলায়িত কুঞ্চিত কৃষ্ণ কুন্তল স্তবকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক হাসিয়া বলিলাম “রূপ, এমন রূপ আমি কখনো

দেখিনি"—"ছাই রূপ, আমার বড় লজ্জা করে!" বলিয়া বালিকা তাহার সুকোমল বিকসিত কমলের ন্যায় উৎফুল্ল মুখ খানি আমার বক্ষে ধীরে ধীরে নত করিল; হর্ষে আমার চক্ষু মুদিত হইল। যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়াছে এবং উষার লোহিত কিরণ বাতায়নপথে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। আমি আমার গৃহকক্ষেই শয়ন করিয়া আছি, সেই সুবিস্তীর্ণ সরোবর, রম্য পুষ্পকানন এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার নয়নপথ হইতে সহসা অপসারিত হইয়াছে; কোথায় কাব্যজগতের সেই মিলন-সুখমগ্ন প্রেমসুপ্ত আত্মহারা নায়ক, আর কোথায় এই ক্ষুদ্র গ্রাম প্রান্তে ক্ষুদ্র অট্টালিকা প্রকোষ্ঠে, নিতান্ত নীরস গদ্যময় শয্যাশায়ী সদ্যজাগ্রত বিরহী বঙ্গ যুবক! আমি উঠিয়া বসিলাম, হৃদয়ের অনেক খানি অংশ শূন্য বোধ হইল, কিছুতেই সে মুখ খানি আর ভুলিতে পারিলাম না, এই স্বপ্ন-দৃষ্টা বালিকার মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিল।

—৮৫—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যজীবনে সময়ে সময়ে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যাহার কারণ কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি কেবল যে সেই এক রাত্রিতেই স্বপ্ন ঘোরে সেই অলোক-সম্ভবা সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা নহে, তাহার পর প্রায় প্রতিরাত্রেই স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম; প্রত্যহই তাহার ব্যাকুলতাপূর্ণ কোমল দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত দেখিতাম, বোধ হইত তাহার যেন বিশেষ কিছু বলিবার আছে—কিন্তু তাহার মুখে আর কোন দিন একটি কথাও শুনিতে পাইলাম না; তাহার আয়ত চক্ষু ও নির্ব্বাক মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া এক এক সময় মনে হইত এ বুঝি কোন বিখ্যাত শিল্পী বিরচিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই বিধাতা বুঝি তাহাতে এত কোমলতা, লাবণ্য এবং জীবন্তভাব ঢালিয়া দিয়াছেন।

আমি ক্রমে এই বালিকার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম, বুঝিলাম এই দুর্লভ বালিকাকে জীবন সঙ্গিনী করিতে না পারিলে আমার জীবন বৃথা। কিন্তু সে স্বপ্নরাজ্যের অর্দ্ধস্ফুট কুসুম, ত্রিদিবের প্রেম পারিজাত, তাহাকে আমি এ পৃথিবীতে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? বাল্য কালে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনিয়াছিলাম কোন্ কালে এক রাজপুত্র এইরূপ এক স্বপ্নদৃষ্টা নারীর সন্ধানে সোণার তরণীতে

চড়িয়া সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাত্রা করিয়াছিল, সেখানে এক নির্জ্জন দ্বীপে, একটি সমুন্নত প্রাসাদের উপর রাজকন্যাকে কে মরণকাটী ছেঁায়াইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল, জীবনকাটী না ছেঁায়াইলে তাহাকে চেতন করা যাইত না। ঠাকুরমার রাজপুত্র বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে জীবনকাটী আবিষ্কার পূর্ব্বক সেই রাজকন্যাকে জাগাইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। হায়, আমি ক্ষুদ্র একালের মনুষ্য, এমন মন্ত্র কোথায় পাইব যাহার বলে স্বপ্নের সেই ছায়াময়ী প্রতিমাকে মানবীরূপে আমার গৃহ কোণে সংস্থাপিত করিতে পারি; বুঝিলাম আমার আশা সম্পূর্ণ বৃথা। সময়ে সময়ে আমার মনে হইত আমি বুঝি উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, হৃদয় সংযত করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বপ্নে আবার সেই মোহিনী মূর্ত্তি অবিকৃতভাবে আমার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা নদীর খরস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইত; আমি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম। হায়, সে আমাকে পাগল করিয়া ভুলিবে, সুপ্তির রসাতল গর্ভ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনি আমার এমন ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে কাহারো সাহায্য পাইবারও আশা নাই, সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না; এই মানসিক অশান্তির উপর অন্যের হাস্যাস্পদ হইবার জন্য আমার কিছু মাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু কাহাকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও আমার আকার প্রকারে এত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল যে আমার পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজন আমার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুই এক জন বন্ধু স্থান পরিবর্ত্তনেরও ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু শরীর অসুস্থ বোধ হওয়াতে সে সময় বাড়ী ছাড়িয়া একাকী বিদেশে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। বাবা বহরমপুরে নবাব সরকারে একটা বড় চাকরী করিতেন, তিনি আমাকে সেখানে যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। আমি বহরমপুরে পৌঁছিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেখানকার একজন প্রধান চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, চিকিৎসকটি বাবার একজন পুরাতন বন্ধু, জানিতাম কোন চিকিৎসকের সাধ্য নাই আমার এই উৎকট মনোব্যাধি আরোগ্য করেন, কিন্তু পিতার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষণীয় নহে।

পিতৃবন্ধু ডাক্তারটি প্রবীন, মস্তকের চুল হইতে দাড়ী গোঁফ সমস্ত সাদা, মুখশ্রী গম্ভীর, দেখিয়াই মনে একটু সম্ভ্রমের সঞ্চার হয়। বাবা বোধহয় পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমার কথা বলিয়াছিলেন, পরিচয় পাইয়া আমাকে তিনি সমাদরের সহিত আহ্বান করিলেন, তাহার পর তাঁহার হাতের কাজ শেষ হইলে একটা চেয়ার টানিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ করিবার পূর্ব্বে আমি

একবারও ভাবি নাই যে আমার মনের কথা কোন কারণে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে, বা তাহা ব্যক্ত করিয়া কিছু লাভ আছে। সুতরাং প্রথম হইতেই আমি স্থির করিয়াছিলাম এ স্বপ্ন বিবরণ প্রাণান্তেও কাহারো কাছে প্রকাশ করা হইবে না। ডাক্তার বাবু আমার রোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমি অতি সংযতভাবে উত্তর করিলাম "আমার কোন রোগ নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা আমার শরীর কিছু দুর্ব্বল হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু এই দুর্ব্বলতার কারণ বুঝিতে পারি না, হয়ত ইহা স্বাভাবিক; এই সামান্য কারণে আপনার নিকট আসিবার কোন আবশ্যক ছিল না, শুধু বাবার অভিপ্রায় অনুসারে আসিয়াছি।"

ডাক্তার বাবু একবার গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন, আমার বুক, পিঠ চোক প্রভৃতি অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন "লংস্ কিম্বা অন্য কোথাও কিছু ব্যতিক্রম দেখিতেছি না, তুমি কোন রকম অসুখ বুঝিতে পার কি ?"

আমি উত্তর করিলাম "না, আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন "শরীর ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্ক নামক একটা যন্ত্রের কথা বোধ হয় তোমার অজ্ঞাত নহে ?"

আমি একবার শূন্য দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ ব্যাকুল ভাবে

তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি কি তবে মনে করিতে-ছেন আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে?— অধিক ইতস্ততঃ না করিয়া আমি বলিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ, মস্তিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে।"

ডাক্তার— "সেই মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া অসম্ভব নয়।"

"না হইতে পারে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, সে জন্য আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।" ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে আমি এই কথা বলিলাম।

ডাক্তার বাবু বোধহয় তাহা বুঝিলেন, গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "কিন্তু তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এ রকম একটা সন্দেহ কি কখন তোমার মনে উদয় হয় নাই?"

অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু কি উত্তর দিব? সবিস্ময়ে বৃদ্ধ ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ডাক্তার বাবু সহজ ভাবে বলিলেন "বোধহয় তোমার গাঢ় নিদ্রা হয় না, আমার অনুমান হইতেছে তুমি নিদ্রাবস্থায় অধিকাংশ সময়ই স্বপ্ন দেখ।"

বুঝিলাম ধরা পড়িতে বিলম্ব নাই। চেয়ারে বসিয়াছিলাম, কিছু বেগের সহিত চেয়ার টানিয়া তাঁহার আরো কাছে আসিয়া বসিলাম, সংক্ষেপে উত্তর করিলাম, 'আপনার অনুমান যথার্থ।"

ডাক্তার বাবু আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,

ধীরে ধীরে বলিলেন "স্থির হও. আমার অনুমান সত্য হইবে তাহা জানি, ডাক্তারি করিতে করিতে এত কাল কি বৃথাই চুল পাকাইলাম ? – কিন্তু সে যাহা হউক, তোমার যদি কিছু গোপনীয় কথা থাকে আমাকে অবাধে বলিতে পার ; কোন কথা লুকাইবার কিছু আবশ্যক নাই, যদি কোন কথা গোপন কর তাহা হইলে হয় ত আমার চেষ্টা বৃথা হইবে, তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না।"

দুই মিনিট আগেও ভাবি নাই যে কথা আমার হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তলে লুক্কাইত আছে, যাহা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার প্রিয়তম বান্ধবের নিকট ব্যক্ত করি নাই তাহা ডাক্তার বাবুর কাছে এখনই প্রকাশ করিতে হইবে ! ডাক্তারেরা শরীরের উপর অত্যাচার করেন তাহা সহ্য হয়, কিন্তু মনের উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া তাঁহা-দের সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু এই ডাক্তারের জেরা অতি কঠিন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় তাঁহার উপর আমার অনেক খানি ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল. আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় কোন আপত্তিও দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং তাঁহার নিকট সমস্ত কথা সরল ভাবে ধীরে ধীরে বিবৃত করিলাম।

আশ্চর্য্য ! ডাক্তার বাবু কিছু মাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না ; পূর্ব্বশ্রুত গল্পের মত আমার কাহিনী শুনিয়া গেলেন।

অনেক ক্ষণ চিন্তার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " যদি তুমি একান্ত আগ্রহের সহিত চেষ্টা কর তাহা হইলে সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকাকে ভুলিয়া থাকিতে পার না কি ? "

আমি নত মস্তকে উত্তর করিলাম " চেষ্টা করি নাই, সম্ভবতঃ পারি।"

" তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ না, এক মাস পরে আবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ো, কেমন থাক শুনিব।"

বাসায় ফিরিলাম। নানা কার্য্যে, পাঠে, বৈষয়িক চিন্তায় এবং আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিয়া সেই মুখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কতকটা কৃতকার্য্যও হইলাম; কিন্তু হায়! প্রত্যহ রাত্রে, নিদ্রাবস্থায় সেই মানসীমূর্ত্তি অবিকৃতভাবে আমার মানসপথে আবির্ভূত হইতে লাগিল।

এক মাস পরে ডাক্তারকে একথা জানাইলাম। ডাক্তার বাবু শুনিয়া কিয়ৎকাল নত মুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিলেন " এই বালিকার মূর্ত্তি তোমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে, দেখ যদি তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাও।"

খুঁজিয়া পাইব! তাহা হইলে ডাক্তার বাবু কি আমাকে উপহাস করিলেন? স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়াছি, জীবরাজ্যে যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই বিপুল পৃথি-

বীতে কোথায় তাহাকে খুঁজিয়া পাইব?—ইহা কি সম্ভব?—না হউক, তথাপি একবার তাহার অনুসন্ধান করিব, চেষ্টা করিয়া দেখিব তাহাকে কোথাও পাওয়া যায় কি না! আমি ডাক্তার বাবুকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি সত্য সত্যই তাহার অনুসন্ধানের পরামর্শ দিতেছেন, না উপহাস করিয়া এরূপ বলিলেন?

"এ প্রকার গুরুতর বিষয় লইয়া আমি কখন উপহাস করি'না।" গম্ভীর ভাবে ডাক্তার বাবু এই উত্তর দিলেন।

"কিন্তু কোথায় তাহাকে খুঁজিয়া পাইব? বসুন্ধরা বিস্তীর্ণ, জন সংখ্যা বিপুল, বিশেষতঃ হিন্দু পরিবারে অবরোধ প্রথা প্রচলিত।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। চেষ্টা কর, স্বপ্নে যে স্থানের চিত্র দেখিতে পাও সেই স্থানের অনুসন্ধান কর।"

"তাহা হইলে কি তাহাকে দেখিতে পাইব?"

"অসম্ভব কি? কোন কোন গ্রন্থে পাঠ করা গিয়াছে যে সকল আত্মার সহিত স্বপ্নাবস্থায় আমাদের সাক্ষাৎ হয়, হইতে পারে তখন তাহারা দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় আমরা কেহ কাহারো পরিচয় জানি না।"

এমন অবিশ্বাস্য কথা ডাক্তার বাবু কোন কোন পুস্তকে পড়িয়াছেন বলিলেন! দর্শন বিজ্ঞানের মধ্যে কোথাও ত এ কথা খুঁজিয়া পাই নাই, আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোন্ গ্রন্থে এমন কথা পড়িয়াছেন আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

ডাক্তার বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "তত্ত্ববিদ্যা—Theosophy সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে কখন তুমি আমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইতে না, আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে তুমি এম. এ. পাশ করিয়াও তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে কোন কথা জ্ঞাত নহ। ম্যাডাম ব্লাভাড্স্কি ও কর্ণেল অলকট দেহ এবং আত্মা সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া গিয়াছেন যে তাহা পাঠ করা থাকিলে তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতে তোমার ও এই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকার আত্মার মধ্যে কোন রকমের একটা অবিচ্ছেদ্য, অদৃশ্য যোগ আছে।"

বুঝিলাম ডাক্তার বাবু আমার স্বপ্নের কথা সত্য সত্যই অবিশ্বাস করেন নাই, থিয়জফির ভূত ঘাড়ে চাপিলে মনুষ্যের কাণ্ডজ্ঞান অনেক সময় কমিয়া আসে জানিতাম; কিন্তু আজ ডাক্তার বাবুর মতটা আমার ভালই লাগিতেছিল। মনে মনে একটু আনন্দ বোধ হইল, ভাবিলাম ভাগ্যে ডাক্তার বাবু একটি প্রকাণ্ড থিয়জফিষ্ট!—কিছু কাল নীরব থাকিয়া আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহা হইলে আমি কি একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিব?"

"মন্দ কি—আমার বিবেচনায় চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল।"—ডাক্তার বাবু আর কোন কথা বলিলেন না, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমি বাসায় ফিরিলাম।

বাবা ও মা শীঘ্রই আমার এই পাগলামীর কথা শুনিতে পাইলেন। প্রথমে যখন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমার দেশ ভ্রমণে যাইবার কথা হয়, সে সময়ে তাঁহারা সে প্রস্তাবে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু আমি এখন মরী-চিকার সন্ধানে সংসার মরুভূমে ছুটিতে চাই শুনিয়া তাঁহারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক লেখা পড়া শিখিয়া আমার মস্তিষ্ক যে সম্পূর্ণ বিগড়াইয়া গিয়াছে মা বাবার কাছে এ কথাও বলিলেন এবং পরিশেষে ঔষধ স্বরূপ একটি সুন্দরী কন্যার সন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু আমার এই পাগলামীর পোষকতা করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার উপরও তীব্র গালাগালি বর্ষিত হইল; কিন্তু আমার সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইল না। সেই দিন গভীর রাত্রে আমি গৃহ ত্যাগ করিলাম, পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে বটে, কিন্তু যাহাতে তাঁহারা কিছু চিন্তিত না হন তাহারও উপায় করিয়া রাখিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু কোথায় যাইব? সম্মুখে সহস্র পথ বর্ত্তমান, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? ডাক্তার বাবুর কথাগুলি পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আমাকে উপহাস করেন নাই, তবে আমাকে এমন এক অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে—আকাশ কুসুম চয়ন করিতে প্রবৃত্তি দিলেন কেন? আমাকে কি অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত? অসম্ভব কি?—যাহাই হউক তাঁহার কথাগুলি আমার হৃদয়ে এক অভিনব বিশ্বাসের রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন "চেষ্টা কর, স্বপ্নে যে স্থানের চিত্র দেখিতে পাও সেই স্থানের অনুসন্ধান কর"—কিন্তু তাহাও ত সহজ কাজ নহে; তবে স্বপ্নের সেই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিয়াছি—যেখানেই হউক, তাহা পল্লীগ্রামের দৃশ্য নহে। অতএব আমি কতকগুলি প্রধান প্রধান নগর পরিভ্রমণের সংকল্প করিলাম।

গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সেদিন তাহার মুখচ্ছবি বিষণ্ণ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আমার কল্পনা কি না ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আমি বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মতলায় এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় লইলাম, অনেক দিন পরে একদিন

প্রভাতে আমার অতর্কিত আবির্ভাবে বন্ধুবর কিছু বিস্মিত হইলেন, হাসিয়া বলিলেন—

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে ব'সো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

"তবে 'অসময়ে বঁধুয়া কেন হে পরকাশ'?"

আমি বলিলাম "উমেদারী করিতে, জমীদারী ত নাই।"

বন্ধু অতিরিক্ত রহস্যপ্রিয়, পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের উমেদারী, প্রেমের? বলত বাগবাজারের সেই ঘটকীটাকে——"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম "ভাই, ওসকল আলাপ এখন থাক, সমস্ত রাত্রি ট্রেণে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে, রহস্যালাপটা পরিপূর্ণ আহার ও নিদ্রার পরই জমে ভাল।"

বন্ধু দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া পরিচারককে চা'এর আয়োজন করিতে বলিলেন। খুব সমারোহ পুর্ব্বক বন্ধুগৃহে দিনপাত হইতে লাগিল, ভাবিলাম ডাক্তারের পরামর্শ মত দেশভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে একবার কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া বালিকার অনুসন্ধান করা মন্দ নয়।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া আমার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। কলিকাতায় পদার্পণ করার পর একদিনও আমি সেই বালিকাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই নাই; ইহার

কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার বাবুর পরামর্শে যে একমাস তাহাকে ভুলিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে সময় স্বপ্নে প্রতিরাত্রে সে নিয়মিতরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত, কিন্তু এখন আমি সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তির অনুসরণ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছি—আর সে স্বপ্নেও দুর্লভ হইয়া উঠিল! হায়, রমণী-হৃদয় কি এমনি চঞ্চল! যতক্ষণ তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবে ততক্ষণ সে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিবে, কিন্তু তাহার অনুসরণ করিবামাত্র সে সরিয়া দাঁড়াইবে!

রাত্রির পর রাত্রি কাটিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্বে যখন সে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত, তখন মনে হইত নয়ন সমক্ষে এ মরীচিকার উদয় না হওয়াই ভাল, কিন্তু এখন দেখিতেছি রোগ অপেক্ষা ঔষধ সাংঘাতিক। কত দিন ধরিয়া আমি এই উন্মাদকরী স্বপ্নের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছি, এত দিন পরে সে যত্ন সফল হইয়াছে তথাপি আমার মানসিক অশান্তির হ্রাস হইল না!—যাহাহউক অবশেষে আমার ব্যাধী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে ভাবিয়া বহরমপুরে ফিরিয়া আসাই উচিত মনে করিলাম।

আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি ভাবিলাম বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিকতর চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম;

দুই মাস পরে কলিকাতা হইতে বহরমপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

বহরমপুরে আসিয়া সেই দিনই বৈকালে ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাসাতেই ছিলেন, আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে বলিলাম "খবর ভালই, আমার বাতিক আরাম হইয়াছে।"

"আরাম হইয়াছে!"—তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, অবশেষে বলিলেন "তোমাকে দেখিয়া ত তাহা বোধহয় না, কিরূপে আরোগ্য লাভ করিলে?"

"আমি আর স্বপ্ন দেখি না। এখান হইতে যাওয়ার পর আমি একদিনও স্বপ্ন দেখি নাই।"

"এত দিন কোথায় ছিলে?"

আমি বলিলাম "কলিকাতায়।"

ডাক্তার বাবু প্রশ্ন করিলেন "এই দুই মাস বরাবর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কলিকাতায় যত দিন ছিলে স্বপ্নে একদিনও সেই বালিকাকে দেখিতে পাও নাই?"

"না।"

ডাক্তার—"এখানে ফিরিয়া?"

আমি বলিলাম "আজ সকালে এখানে আসিয়াছি।"

ডাক্তার বাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; তাহার পর আমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া একটা বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ঔষধের প্রতি আমার কিছু মাত্র আস্থা ছিল না, ঔষধ দ্বারা এ মানসিক বিকারের কি প্রতিকার হইবে? যাহাহউক ঔষধের শিশিটা পকেটে ফেলিয়া আমি বাসায় ফিরিলাম। পথশ্রমে বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। তিন দিন হইল কোন বৈষয়িক কার্য্যের অনুরোধে বাবা বাড়ী গিয়াছেন, সুতরাং আপাততঃ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

অতি প্রত্যূষে উঠিলাম। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি! দীর্ঘকালের পর স্বপ্ন অতি উজ্জ্বল ও মধুর বোধ হইল। বালিকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও প্রীতি আমার নিদ্রিত চেতনাকে মোহিত করিবার জন্যই যেন আমার মানসনয়ন সমক্ষে সমুদিত হইয়াছিল। স্বপ্নে তাহাকে যতবার দেখিয়াছি, এমন সুস্পষ্টরূপে আর কখন দেখি নাই, যদি চিত্রকর হইতাম তাহা হইলে বুঝি এই ছবি দেখিয়া তাহার নিখুঁত চিত্র আঁকিতে পারিতাম!

সকালে উঠিয়া অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম, কিন্তু আমার মনে একটি চিন্তা প্রবল হইল, কলিকাতায় যত দিন ছিলাম একদিনও তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম না, আজ বহরম-

পুরে আসিয়াছি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম ইহার অর্থ কি? এই গভীর রহস্যভেদ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, সুতরাং কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

বাবা পরদিন বাড়ী হইতে বহরমপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমাকে যথেষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন, আমি কি উত্তর দিব? সুতরাং অধোমুখে চুপ করিয়া রহিলাম। জানা ছিল বোবার শত্রু নাই, কিন্তু আমাকে নিরুত্তর দেখিয়াও বাবার রাগ কমিল না, অনেক গালাগালি বর্ষণের পর তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তোমার শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপই দাঁড়াইতেছে, তোমার মানসিক শান্তিও নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; দেখিয়া শুনিয়া আমি তোমার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি এবং অনেক সন্ধানে একটি বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা সুন্দরী বালিকাকে মনোনীত করিয়াছি।"

এ কালের শিক্ষিত ইয়ংম্যান হইলেও আমি হিন্দু যুবক, মায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে দুই একটা কথা চলিতে পারে বটে কিন্তু নিজের বিবাহ লইয়া বাপের সঙ্গে তর্ক, ইহা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু আমার অবস্থাও শঙ্কটাপন্ন, সুতরাং কিছুকাল চিন্তার পর সসঙ্কোচে অবনত মস্তকে উত্তর করিলাম,—"আপাততঃ এ সম্বন্ধে আপনি বেশী কিছু না বলিলেই ভাল হয়; বিবাহটা জোর করিয়া ঔষধির মত গিলাইয়া দিলে সর্ব্বত্র শুভফল লাভ করা যায় আমার এমন

বোধ হয় না। আমাকে আরো কিছু সময় দেন, ইতি-মধ্যে আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইব।"

বাবা বোধ হয় আমার কথায় অনেকটা ভরসা পাই-লেন, এবং আর অধিক জেদ করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া বলিলেন "ইতিমধ্যে বিবাহ করিতে নিতান্ত না চাও, আরো পাঁচ ছয় মাস বিলম্ব করিতে পার, কিন্তু মোটের উপর আমি যেখানে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি সেখানেই বিবাহ করিতে হইবে, আমি বাপু কথার নড়চড় করিতে পারিব না, বড় জোর না হয় কনের মাতামহকে বলিয়া আরো কিছু কাল বিবাহ স্থগিত রাখিব।"

আমি মাথা চুলকাইয়া নিম্নস্বরে বলিলাম "এজন্য তাদের এত সাধ্য সাধনার আবশ্যক কি? মেয়ের ত আর এত অভাব হয় নাই যে একটি হাত ছাড়া হইলে আর মিলিবে না।"

বাবা ঈষৎ কোপের সহিত উত্তর করিলেন "সে কথা আমি বুঝিব। বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া না রাখিলে ছ'মাসের পরে আবার তুমি বছর খানেকের মত সময় চাহিবে, সে হইবে না।"

বাবার সঙ্গে আর অধিক কথা হইল না। পুনর্ব্বার কনে খুঁজিতে বাহির হইলাম। হায়! কে জানে কখন আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে কি না?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
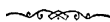
বহরমপুর ছাড়িবার আগে আর একবার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম; আমি যে পুনর্ব্বার সেই ছায়াময়ীর সন্ধানে যাইতেছি তাহাও জানাইলাম। আমার বহরমপুরে ফিরিয়া আসার পর আবার স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়াও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন—"তোমাকে সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি দিয়া ভাল করিয়াছি কি না বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু তুমি যে আমার পরামর্শ মত কাজ করিতেছ ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, হয় ত তোমার দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের একটি গুপ্ত সত্য প্রকাশিত হইবে, কিন্তু আমি তোমাকে আর একটি পরামর্শ দিতে চাই।"

আমি বলিলাম "বলুন, আমাকে কি এই অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "না, নিবৃত্ত হইতে বলি না, কিন্তু তুমি তোমার ভ্রমণের একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া লও; তুমি একবার প্রয়াগ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি

স্থান পর্য্যটন করিয়া দেখ. বঙ্গদেশ হইতে অনেক ভদ্রলোক এ সময় ঐ সকল তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ তুমি তোমার স্বপ্নদৃষ্টা কামিনীর সন্ধান পাইলেও পাইতে পার; আর তাহা না হইলেও তীর্থ ভ্রমণের আর একটা সুফল এই যে তাহাতে তোমার মন সংযত ও স্থির হইতে পারে। তাহার পর তোমার পিতা তোমার নিকট যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য হইবে। বিবাহ করিয়া সাংসারিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেই তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।"

আমি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তাঁহাকে বলিলাম "আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমি যে উদ্দেশ্যে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইব তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি? আপনি কি অনুমান করেন?"

ডাক্তার বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন "বাপ্, এ প্রশ্নটি সহজ বটে কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইহার পূর্ব্বেও তুমি একবার আমাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তখন তোমাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম, এখন যে তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; তবে তাহার পর এ সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি, যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে এই বোধ হয় যে তোমার স্বপ্নদৃষ্টা বালিকা জীবিত আছে এবং তাহার ইচ্ছাশক্তি—will force তোমার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তির এরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত

অত্যন্ত সাধারণ না হইলেও একেবারে দুর্লভ নহে; যাহার দ্বারা এই শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে জাগ্রত অবস্থায় তুমি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কিনা তাহা বলিতে পারি না, চিনিতে পারা যেমন সম্ভব না পারাও সেইরূপ সম্ভব; তবে নিদ্রিত অবস্থায় সে যে তোমার অনুরাগিণী তাহা তোমার কথা হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিয়ো এ সমস্তই অনুমান, কোন অনুমানই অভ্রান্ত নহে। হয় ত স্বপ্ন জগৎ ভিন্ন ভৌতিক জগতে সে বালিকার অস্তিত্ব নাই, হয় ত এ তোমার কল্পনার ছলনা মাত্র; এরূপ অবস্থায় তাহাকে অলীক স্বপ্ন বলিয়াই ভাবিয়া লইতে হইবে, তবে যে তুমি পুনঃ পুনঃ এই একই স্বপ্ন দেখিতে পাও সে হয় ত তুমি অনন্যমনে সর্ব্বদা এই কথাই চিন্তা কর বলিয়া।”

আবার আমি সন্দেহের গভীর জলে পড়িলাম; মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম,—“কিন্তু আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম তখন সর্ব্বদাই তাহার কথা চিন্তা করিতাম, তথাপি সে সময় একদিনও ত তাহাকে স্বপ্নে দেখি নাই।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন “ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত, বিশেষতঃ মনুষ্যের জ্ঞান অল্প এবং সীমাবদ্ধ, —‘There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy’!”

ডাক্তার বাবু রোগী দেখিতে বাহির হইলেন; আমি হৃদয়ভার লইয়া বহরমপুর ত্যাগ করিলাম।

* * * * *

অনেক তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কোথাও ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাইলাম না; ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ মাস এইরূপ পথে পথে বৃথা কাটিয়া গেল। বাবাকে বলিয়া আসিয়াছি ছয় মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিব, তিনি আমার জন্য কনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে বিবাহ করিয়াই সুখী হইতে চেষ্টা করিব। আর অনর্থক এ দীর্ঘ পর্য্যটন, এ নিদারুণ উদ্বেগ, এ শান্তিহীন তৃষিত মরুজীবনের অবিরাম হাহাকার অসহ্য; এখন বিস্মৃতিতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার শান্তি।

কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিব তাহাকে যদি ভালবাসিতে না পারি! সেই বালিকা যদি চিরজীবনের জন্য অশান্তি ভোগ করে, এবং ম্লানমুখে, কাতরভাবে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে তবে আমি তাহা কিরূপে সহ্য করিব? নিজের বেদনা সহা যায়, কিন্ত আমার ব্যবহারে যে আর একজন বেদনা পাইবে ইহা অসহ্য।

তদ্ভিন্ন আরো একটা গুরুতর কথা ছিল, যে ছায়াময়ী মূর্ত্তির সন্ধানে আমি এতদিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম, একদিন হঠাৎ যদি সে আমার সম্মুখে পড়িয়া যায়, আমি যেমন অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহাকে খুঁজিতেছি, সেও যদি সেইরূপ

অতৃপ্তির সহিত আমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, তাহার পর দেখিতে পায় যে আমি তাহার রহস্যময় ইঙ্গিতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্য একজনকে জীবনসঙ্গিনী করিয়াছি তাহা হইলে কি তাহার কোমলহৃদয় বিদীর্ণ হইবে না?

আর বিশ দিন মাত্র সময় আছে; কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। দুই এক দিন পরে আমার একটি কলিকাতাবাসী বন্ধু তাঁহার ভ্রাতার বিবাহে বরযাত্রী হইবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন, আমার মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে কোন উৎসবে যোগ দেওয়ার আমার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু বন্ধুগণের নিদারুণ বিদ্রূপবাহুল্য ভয়ে বরযাত্রীদলের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

সন্ধ্যার পর বরযাত্রীদল কন্যাকর্ত্তার গৃহে সমাগত হইলেন। কনের পিতা হাইকোর্টের জনৈক খ্যাতনামা উকীল। তাঁহার বাড়ী গঙ্গার ধারে; বিচিত্র বাতায়নশ্রেণী শোভিত শুভ্র, উন্নত, ত্রিতল সৌধের সুদৃশ্য কক্ষগুলি ভাগীরথী-বক্ষ হইতে সুন্দর দৃশ্যপটের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল।

আজ এক বৎসর হইল, এক ফাল্গুনের রাত্রে একটি মোহকর স্বপ্নে আমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং আজ এতদিন পরেও তাহার উন্মাদনায় আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! বসন্তের ঈষৎ শীতল নৈশবায়ু হিল্লোল তেমনি সুখকর এবং জীবজগতের শোক হর্ষ কল্লোল

পূর্ব্ববৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ, কেবল একটি বৎসরের স্মৃতি ও চিন্তা আমার হৃদয়ে এক যুগব্যাপী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। আমি বরযাত্রীদলের সহিত মঙ্গলোচ্ছ্বাসপূর্ণ উৎসবপ্রাঙ্গনে উৎফুল্ল জনতার ভিতর প্রবেশ না করিয়া নদীতীরে এক আলোকস্তম্ভের অদূরবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিজের এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। পরিষ্কার আকাশে অনন্ত নক্ষত্রের উজ্জ্বল দীপ্তি, এবং অদূরে ভাগিরথীবক্ষে শত শত নৌকায় প্রদীপের ম্লান আলোকচ্ছটা তিমিরাবগুণ্ঠিতা নিশীথিনীর শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছিল।

আমি ভাবিতেছি; একবার অন্ধকারময় ভাগীরথী জলে একবার বা পরপারের তিমিরাবৃত অট্টালিকা ও বৃক্ষাবলীর দিকে চাহিতেছি, এমন সময় জনবিরল "ষ্ট্রাণ্ডরোড্" প্রতিধ্বনিত করিয়া দুইটি কৃষ্ণবর্ণ বৃহদশ্ব সংযোজিত এক খানি সুদৃশ্য "ব্রুহাম" দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া সেই উৎসব-ভবনের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ভিতরে কেহ পুরুষ নাই, আরোহী তিন জন, দুইটি মহিলা এবং তাঁহাদের পরিচারিকা।

প্রথমে পরিচারিকাটি নামিয়া আসিল, তাহার পর একটি বর্ষীয়সী রমণী, পরিচ্ছদ দেখিয়া সধবা বোধ হইল, অনুমান করিলাম ইনি কোন ধনবান ব্যক্তির গৃহিণী। অবশেষে একটি বালিকা অথবা যুবতী, বাল্য ও যৌবন আসিয়া

উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, কোন অবগুণ্ঠন ছিল না, গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম সরল, অপূর্ব্ব সুন্দর, মহিমান্বিত মুখশ্রী। বালিকা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিল, সহসা আমার সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইল। আশ্চর্য্য! এ সেই মুখ এবং সেই দৃষ্টি!! আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, আমি সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। শুনিয়াছি মানবমন কখন চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই মুহূর্ত্তে আমার মন হইতে চিন্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

পুনর্ব্বার যখন চাহিলাম, দেখিলাম গাড়ী কিম্বা আরোহী কেহ নাই! তবে একি স্বপ্ন? চির দিনই স্বপ্ন দেখিব? এত দিন নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি, এখন হইতে কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিব? তাহাই হউক, মরীচিকা যাহার লক্ষ্য, স্বপ্নই তাহার জীবনের অবলম্বন। কিন্তু এ স্বপ্নও এত শীঘ্র বিদূরীত হয় কেন? বিধাতার এ রহস্যের অর্থ কি? হায়, ভ্রান্ত মানবের নিকট তাঁহার কয়টি রহস্যের দ্বারই বা এ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হইয়াছে?

যাহাহউক সংশয় প্রতীতিতে পরিণত হইল; আমি যাহাকে খুঁজিতেছি সে তবে জীবজগতে বর্ত্তমান আছে। একটা সংশয় হইতে বাঁচিলাম কিন্তু অনেকগুলি নূতন সন্দেহ বর্দ্ধিত আকারে আমাকে অধিকতর বিচলিত

করিয়া তুলিল। এ বালিকা কে, কোথায় পরিচয় পাইব? অনুমানে বোধ হইল কোন ধনাঢ্যের কন্যা, তাহার সহিত আমার বিবাহের সম্ভাবনা কতটুকু?—তাহার যে বিবাহ হয় নাই তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? পরস্ত্রী হইলে তাহার কথা চিন্তা করাও পাপ, আর কুমারী হইলেও সে যদি আমার স্বজাতীয়া না হয়? এ সকল কথা পূর্ব্বে কখন আমার মনে উদিত হয় নাই, হইলে হয় ত জীবনের গতি অন্য দিকে পরিচালিত করিতাম। স্বপ্নের মোহে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম হিন্দু সমাজে প্রেমের স্বাধীনতা নাই। স্বপ্নভঙ্গে দেখিলাম এত দিন আমি শুধু নিজের দুর্ব্বল, অসংযতহৃদয় লইয়া প্রাণপণে উদ্দাম বাসনার অনুসরণ করিয়াছি,—বেদনাপ্লুত পরিশ্রান্ত, ক্লান্তহৃদয় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আর ফিরিবার সামর্থ্য নাই। শেষ পর্য্যন্ত দেখা উচিত ভাবিয়া বালিকার পরিচয় লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; কয়েক দিনের মধ্যে ভগ্ন মনোরথে বহরমপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাকে দেশে ফিরিতে দেখিয়া বাবার মনে যে অনেকটা ভরসা জন্মিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। দুই চারি দিন পরেই বিবাহের কথা উঠিল, প্রস্তাব পূর্ব্ব হইতেই একরকম স্থির ছিল, ইতিমধ্যে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আমার ভগিনী লীলার মুখে শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম আগেকার সেই সম্বন্ধই পাকা হইয়া রহিয়াছে, কনের নাম শোভা, তাহার পিতা হাই-কোর্টে ওকালতি করিতেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি নিজে অনেক টাকা উপায় করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন পৈত্রিক সম্পত্তিও আছে।

শোভা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তাহার ও তাহার পৈত্রিক বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাহার মাতামহ বৃদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। শোভা কখন তাহার পিত্রালয়ে কখন মাতামহালয়ে বাস করে। গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে বাবার অনেক দিনের পরিচয়, যাহাতে এই আত্মীয়তা স্থায়ী ও বর্দ্ধিত হয় এই অভিপ্রায়ে বাবা গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীর সহিত আমার বিবাহবন্ধনের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন।— সকল কথা শুনিয়া আমি

গম্ভীরভাবে লীলাকে বলিলাম, "বাবাকে বলিস আমি কখন গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিব না।"

লীলা মুরুব্বিয়ানা ভাবে উত্তর করিল, "ছিঃ দাদা এ যে দেখি তোমার ধনুকভাঙ্গা পণ ; যা ভাল বোঝ কর, তোমার কাছে আমাদের কোন কথা ত আর থাকবে না।"

আমি একটু নরম সুরে বলিলাম, "লীলা, আমি সেই স্বপ্নের মেয়েকে জাগ্রতে দেখেছি, কোনদিন তার সন্ধান পাবই।"

বুঝিলাম কথাটা লীলা অবিশ্বাস করিল, কিন্তু সে আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, দুই এক দিন পরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, সুতরাং আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার দ্বারা আমার মান সম্ভ্রম রক্ষিত হইবে, এখন দেখিতেছি আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, এত দিন ধরিয়া কথা দিয়া আসিয়াছি আজ কি করিয়া গোবিন্দ বাবুকে বলি যে তুমি তাঁহার দৌহিত্রীকে বিবাহ করিতে চাওনা, তিনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই, কিন্তু পিতামাতা যাহাতে অপ্রতিভ ও অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ কখন করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"— বাবার স্নেহ-পূর্ণ মুখে বিষাদ ও কাতরতার চিহ্ন দেখিয়া আমার মুখে কথা ফুটিল না।

রাত্রে খাইতে বসিয়াছি, মা গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাবা, এত লোকে বিয়ে ক'রে কত সুখে ঘরকন্না কচ্চে, আর তোর বিয়ে কর্ত্তে এত অসাধ কেন? স্বপ্নে যাকে দেখেছিস্ তাকে কি কখন পাবি বাবা? কর্ত্তা সম্বন্ধ ঠিক করেছেন, বেশ টুকটুকে মেয়েটি, দিব্য লেখাপড়া জানে, আর দেবে থোবেও ভাল; বড় সাধ ছিল তোর বিয়ে দিয়ে বৌমাকে ঘরে তুলি, তা তুই আমার সে সাধ আর পূরোতে দিলিনে। একশ বছরের হয়ে তুই বেঁচে থাক, কিন্তু বেটার বৌ নিয়ে ঘরকন্না করা আমার অদেষ্টে নেই।" মার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, পাছে আমার কোন অমঙ্গল হয় ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ী বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মোচন করিলেন।

আমি বড় ব্যথা পাইলাম। বাবা ম্লান মুখে কাতর ভাবে বসিয়া আছেন, মার চোখে জল ঝরিতেছে, আমার স্বপ্নই কি বড় হইল? কে জানে তাহা সত্য? কে জানে জাগ্রতেও তাহাকে দেখিয়াছি? হয়ত তাহাও স্বপ্ন, ভ্রান্তি মাত্র; স্বপ্নের কুহকে অন্ধ হইয়া আমি শুধু ভ্রান্তিজালে জড়িত হইতেছি! স্থির করিলাম পিতামাতার প্রীতির জন্য এ হৃদয় সমর্পণ করিব; প্রকাশ্যে বলিলাম "মা, গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিলেই যদি তোমরা সুখী হও, তবে তাহাই হোক, আমি আর এ বিবাহে আপত্তি করিব না, তোমরা দিন স্থির কর।"

গোবিন্দ বাবুর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বাবা দুই দিন পরে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন; আমাকে বলিলেন, "কলিকাতায় কতকগুলি জিনিষ পত্র কেনা দরকার, তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে চলিবে না।" —আমি বাবার সঙ্গে চলিলাম।

বাবার কোন বাল্য বন্ধু ভবানীপুরের একজন জমীদার, বাবার সঙ্গে আমি সেখানেই উঠিলাম, আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বহির্বাটীর একটী কক্ষ ছাড়িয়া দিলেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বাবা গোবিন্দ বাবুর সহিত দেখা করিতে চলিলেন; আমার একটী বন্ধু সম্প্রতি এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন, মধ্যে তাঁহার পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম, তিনি বালিগঞ্জে আছেন, কতদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা নাই; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপরাহ্নে বালিগঞ্জে রওনা হইলাম।

অনেক কাল কলিকাতায় বাস করিয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দিন বালিগঞ্জের ভিতরে যাই নাই, একবার ডায়মণ্ডহারবারে গিয়াছিলাম, রেলের গাড়ী বালিগঞ্জ ষ্টেসনে মিনিট দুই একের জন্য দাঁড়াইয়াছিল, সেই গাড়ী হইতে যতটুকু দেখা যায় বালিগঞ্জ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ততটুকু; পথের ধারে ঝাউ ও দেবদারু গাছের সারি, সুপারী ও নারিকেল গাছের বাগান, জঙ্গলাকীর্ণ

বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটা অট্টালিকা; কোথাও একটা দীঘির ধারে দীর্ঘ রজ্জু টাঙ্গাইয়া তাহার উপর ধোপারা রাশি রাশি কাপড় শুকাইতে দিয়াছে, কোন অরণ্যবেষ্টিত জন-বিরল পথে বা মাঠের মধ্যে ইউনিফর্ম্ম সজ্জিত, চূড়াকার টুপি পরা, দুই তিন জন শ্বেতকায় সৈনিক-পুরুষ বন্দুক ঘাড়ে লইয়া চুরোট ফুঁকিতে ফুঁকিতে সম-তালে পা ফেলিয়া পক্ষী শিকারে চলিয়াছে।

আজ বালিগঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রাস্তাগুলি অতি সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; উভয় পার্শ্বে উচ্চ বৃক্ষ-শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে শোভাময়, সুদৃশ্য ক্ষুদ্র বাগান; অট্টালিকাগুলি কলিকাতার নগ্নকায় সুবৃহৎ হর্ম্ম্য-রাজীর ন্যায় আপনাদিগের শ্বেত ও লোহিত পঞ্জর বাহির করিয়া চক্ষুর অতৃপ্তি উৎপাদন করে না। এই সকল সুগঠিত অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে প্রচুর শ্যামল লতাপল্লব ও বৃক্ষাদি থাকায় সেগুলি অত্যন্ত মনোরম ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছিল।

বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পৃথিবীতে এখনো সান্ধ্য অন্ধকারের ছায়া পড়ে নাই, সমস্ত দিনের রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণী যেন অনেকটা সুস্থির এবং প্রাণী জগতের বিপুল কলরব এখন অনেক পরিমাণে মন্দীভূত। জন-বিরল পথ দিয়া ঘর্ঘর শব্দে দুই একখানি

সুন্দর গাড়ী গড়েরমাঠের দিকে চলিয়াছে, অধিকাংশ গাড়ীতেই শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীগণ বিদ্যমান। স্থানে স্থানে যুবকেরা দল বাঁধিয়া স্ব স্ব হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি একটি নূতন রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। সহসা একটা বাগানের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম এ উদ্যান আমার অপরিচিত নহে; কিন্তু পরিচিতই বা কিরূপে হইবে? আমার জীবনের মধ্যে এ পথে এই সর্ব্ব প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছি। আমার লুপ্ত-স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, --এ সেই স্বপ্নদৃষ্ট উপবন। আমি চলিতেছিলাম, মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইলাম, আমার মনের মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব ক্রিয়া চলিতে লাগিল; আমি মুগ্ধের ন্যায় উদ্যানে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সেই অট্টালিকা, পুষ্পকানন এবং আতট জল-পূর্ণ দীর্ঘিকা। বাঁধাঘাটের নিকট একখানি কাষ্ঠাসনে আমি বসিয়া পড়িলাম; উদ্যানাধিকারীর সম্মতি না লইয়া তাঁহার উদ্যানে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক যে গুরুতর অন্যায় করিয়াছি আমার সে জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরে দেখিলাম একটি রমণী, যেন প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি, কতকগুলি প্রস্ফুটিত কুসুম চয়ন করিয়া অট্টালিকার দিকে আসিতেছেন; আমি

প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, অদূরে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি একবার আমার দিকে চাহিলেন, বোধ হইল আমার দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার মুখ হইতে বিস্ময়-ব্যঞ্জক কোন শব্দ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, আমার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিতেছিল,— ইনি সেই স্বপ্নদৃষ্টা তরুণী। সেই বিবা-হোৎসবের রাত্রে ইঁহাকেই মুহূর্ত্তের জন্য গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছিলাম, সেদিন আমার মনে হইয়াছিল হয়ত আমার কল্পনা আমাকে ছলনা করিয়াছে, কিন্তু আজ আর চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি বিকল হৃদয়ে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখিলাম সন্ধ্যা গাঢ় হইয়াছে; উদ্যান হইতে তাড়াতাড়ী বাহিরে আসিলাম, এ কাহার বাড়ী জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইল কিন্তু জানিতে পারিলাম না, স্থির করিলাম পর দিন আসিয়া সকল সন্ধান জানিয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম; বাবা আমার বিবাহের সকল আয়োজনই ত ঠিক করিয়া ফেলি-য়াছেন, কিন্তু এরকম অবস্থায় গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীকে কিরূপে বিবাহ করি?— অনেক চিন্তার পর মত স্থির করিয়াই বাসায় ফিরিলাম।

তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞই বল আর গালাগালিই দেও, জীবনে আমি এই একবার পিতৃআজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইয়াছিলাম, এই একটিবার মাত্র আমার বিদ্রোহী, অসংযত হৃদয় তাঁহার শাসনরজ্জু ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু সে শুধু তাঁহার অসাধারণ স্নেহের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া। হৃদয়ের মধ্যে পুঞ্জীভূত সহস্র প্রকার চিন্তা, আশা, ভয়, উদ্বেগ লইয়া বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম বাবা গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন, মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন; তাঁহার সেই সদা-হাস্য-বিরাজিত, প্রশান্ত, প্রফুল্ল মুখে বিরক্তি বা ক্রোধের চিহ্ন জীবনে অধিকবার দেখি নাই, তাই নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী ভাবিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু আজ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখনি তাঁহার কাছে আমার মত ব্যক্ত করিতে হইবে, বিলম্ব হইলে হয়ত আমার সকল অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া পড়িবে,— এই এক বেলার মধ্যে তিনি যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও ত জানি না।

আর ইতস্ততঃ না করিয়া বাবাকে স্পষ্ট বলিলাম, "আমি কিছুতেই গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীকে বিবাহ করিতে পারিব না, আপনি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।"

বাবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোরা কি সকলেই পাগল হয়েছিস্? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

গোবিন্দ বাবু ব'ল্লেন তাঁর দৌহিত্রী কিছুতেই বিবাহ কর্ত্তে রাজী নয়, তার কাছে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রস্তাব কল্লে সে একটা অনর্থ ঘটিয়ে বস্‌বে, এদিকে তোর এই দশা; এ হ'লো কি! ইংরেজী শিখে কি তোদের একেবারেই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে?"

গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রীও বিবাহে অসম্মতা?—শুনিয়া আমার মনে একটু আনন্দ হইল; তাহা গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়াই বলিলাম, "গোবিন্দ বাবুর দৌহিত্রী শুনিয়াছি শিক্ষিতা, বিবাহে আপত্তির কোন কারণ থাকিলে অমত প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন!"

আমার কথা শুনিয়া বাবা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এরকম কথা তোর মত পাগলের মুখেই শোভা পায়,—" তিনি বোধ হয় আমার এই অনার্য্যোচিত মতের জন্য আরও দুই একটা দুর্ব্বাক্য বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রলোক অনাহুত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাবা উঠিয়া সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, আমি রক্ষা পাইলাম।

আমি কৃতজ্ঞতা ভরে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিতেই বাবা আমাকে বলিলেন, "গোবিন্দ বাবুকে প্রণাম কর!"

ইনিই গোবিন্দ বাবু?— আমি তাঁহাকে এই প্রথম দেখিতেছি, চুলগুলির অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে কিন্তু ধরণধারণ সমস্ত আধুনিক রকমের, প্রবীণ বয়সের দীর্ঘসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব উভয়ে মিলিয়া তাঁহার মুখের উপর এমন একটা গম্ভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ সরলতা অঙ্কিত করিয়াছে যে তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। গোবিন্দ বাবু আমাকে সময়োচিত দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন, তাঁহার অল্প কয়েকটি কথা শুনিয়াই বুঝিলাম লোকটি সেকাল ও একালের মধুর সংমিশ্রণ!

গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে রাত্রে আহারের জন্য বাবার ও আমার নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তাঁহার দৌহিত্রী বিবাহে অনিচ্ছুক শুনিয়া বাবা কিছু ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন, হয়ত কিঞ্চিৎ অপমানও বোধ করিয়াছিলেন, পাছে আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করি এই ভাবিয়া তিনি নিজেই আমাদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন।

নীচে গোবিন্দ বাবুর 'ল্যাণ্ডো' আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আমরা খিদিরপুরে চলিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ বাবুর দেউড়ীতে গাড়ী আসিয়া লাগিলে আমরা নামিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

বাবা গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; জমীদারীর কথা, মামলা মোকদ্দমার কথা, আরো শুষ্ক কত কথা চলিতে লাগিল, আমার বড় অসহ্য বোধ হইতেছিল, আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সেখান হইতে গোবিন্দ বাবুর বাড়ীর যতখানি অংশ দেখা যায় তাহা সযত্নে দেখিতে লাগিলাম। বাড়ীটি অতি সুন্দর, সাহেবী ধরণে নির্ম্মিত; জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, চন্দ্রালোক ঈষৎ মলিন হইলেও বেশ মধুর; সেই অস্পষ্ট চন্দ্রকিরণ গোবিন্দ বাবুর তুষার-ধবল অট্টালিকায় আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং অদূরবর্ত্তী উদ্যানে অচঞ্চল বৃক্ষগুলি স্নিগ্ধ ছায়া কোলে লইয়া সেই সুধাময় কিরণে নিদ্রা যাইতেছিল।

এমন সময় রমণীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বর অতি মৃদু, কে যেন কোথায় আপন মনে বসিয়া গান গাহিতেছে। যৎপরোনাস্তি কৌতূহল বোধ করিলাম, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম গোবিন্দ

বাবুর অন্তঃপুরের কোন গৃহ হইতে এ স্বর আসিতেছে। দক্ষিণের বারান্দা হইতে অন্তঃপুরের দিকে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারা যায়, অগ্রসর হইয়া রেলিংএর উপর ভর দিয়া গান শুনিতে লাগিলাম, স্বর অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট বোধ হইল, আমি শুনিতে পাইলাম—

"আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশি দিন হেথা ব'সে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
র'ব বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো!"

আমি স্থান কাল ভুলিয়া বিহ্বলচিত্তে এই সঙ্গীতে মগ্ন হইলাম। এ সঙ্গীত কি গায়িকার মর্ম্মোচ্ছ্বাস? ইহা কি সত্যই তাহার প্রাণের ভাষা?— আমার জীবনের সমস্ত, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই সঙ্গীতের প্রতি বর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে, গীতধ্বনি থামিয়া গেলে আমার চৈতন্য হইল, দেখিলাম চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, অন্ধকারে

চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, বাবা ও গোবিন্দ বাবুকে বারান্দায় আমার অদূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিলে আমরা বাড়ীর ভিতর আহার করিতে চলিলাম ; একটি সুসজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল কক্ষে আমাদের আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

আমি গোবিন্দ বাবুর পশ্চাতে ছিলাম, গৃহ-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম সেই গৃহের অন্য একটি দ্বারের সম্মুখে প্রস্ফুটিত কুসুম স্বরূপিণী একটি লাবণ্যবতী কিশোরী,— ইনি কে? উদ্বেলিত হৃদয়ে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম ; আমার দৃষ্টিপাতমাত্রে রমণী ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় চকিতে আমারদিকে চাহিয়া গৃহান্তরে অপসৃত হইলেন, কিন্তু আমার চক্ষু প্রতারিত হয় নাই, এ সেই মূর্ত্তিই বটে! ইঁহার সঙ্গীতেই কি আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তবে কি সে স্বপ্ন এই বালিকার জীবনও ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে? এতদিন ধরিয়া নিশি নিশি যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, দিবসে সহস্র কাজের মধ্যেও যাহার চিন্তা আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছে, আজ এই এক বৎসর ধরিয়া দেশে দেশে যাহার বৃথা অনুসন্ধানে ফিরিয়াছি, আজ সেই স্বপ্নের রত্ন এখানে?— না জানি গোবিন্দ বাবুর ইনি কে? আমি আড়ষ্ট ভাবে আসনের উপর উপবেশন

করিলাম এবং অতি কষ্টে মনোভাব সংগোপন করিতে হইল, কিন্তু বাবা আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

স্নেহভাজন হওয়া সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে, পুত্রের শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা পিতা মাতা যত সহজে বুঝিতে পারেন এমন আর কেহই পারে না, আমি বাবার প্রশ্নে প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম, শেষে জড়িতস্বরে বলিলাম, "হঠাৎ বড় অসুখ বোধ করিতেছি।"

আহারাদির পর বাসায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু হিম লাগিয়া অসুখ বাড়িতে পারে ভাবিয়া গোবিন্দ বাবু সে রাত্রে আর আমাদিগকে বাসায় আসিতে দিলেন না।

*　　*　　*　　*　　*

এক বৎসর পরে আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি ফিরিয়া আসিয়াছে। বালিগঞ্জের সেই উপবনস্থ দীর্ঘিকার অচঞ্চল স্বচ্ছ সলিলে একখানি ক্ষুদ্র তরণীর উপর বসিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভে সমাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রকৃতির নীরব মাধুরী উপভোগ করিতেছি, এবং একবার আকাশের দিকে ও একবার আমার পার্শ্ববর্ত্তী আর একখানি মুখচন্দ্রমার দিকে চাহিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিতেছি, কোন্ খানি অধিক সুন্দর। এমন সময় শোভা ধীরে ধীরে তাহার ললাট হইতে

কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশস্তবক সরাইয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিতেছ?"— আমি বলিলাম, "শোভা, এতদিনে আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে; আমি প্রথমে যে দিন তোমাকে স্বপ্নে দেখি সেই স্বপ্ন দৃশ্য আর আজিকার এই প্রকৃত দৃশ্য অভিন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, তাই সেই স্বপ্নের ছবি ও এই সত্যের ছবি মিলাইয়া দেখিতেছি। এই সারা বৎসর আমি তোমাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি?" —লজ্জাবনতমুখী শোভা মৃদুহাস্যে উত্তর করিল, "আমিও তো তোমারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম।"

ফাল্গুন মাসের শেষে আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেই এক দিন সন্ধ্যাকালে বালিগঞ্জের সুবিস্তীর্ণ সুন্দর উপবনে তস্করের ন্যায় অনধিকার প্রবেশ করিবার সময় আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই উদ্যান-প্রান্তবর্ত্তী প্রশস্ত অট্টালিকা আমার প্রিয়তমার পিতৃগৃহ এবং ইহার প্রত্যেক কক্ষ কখন আমার নিজগৃহের ন্যায় সুপরিচিত হইবে;—শোভাই যে আমার পিতৃ-বন্ধু গোবিন্দ বাবুর আদরিণী দৌহিত্রী এ কথা তখন একবার কল্পনাও করিতে পারি নাই, কিন্তু কল্পনার অতীত বিষয়ও সত্যে পরিণত হইতে দেখা যায়, তাই বুঝি কবি বলিয়াছেন:—

"*Truth is stranger than fiction.*"

সত্য ঘটনা না ভৌতিক কাণ্ড ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেডিকেল কলেজ হইতে এম্, বি, পাশ করিয়া আমি নন্দনগাছির চৌধুরী বাবুদের পারিবারিক চিকিৎসক (Family physician) নিযুক্ত হইলাম, বেতন তেমন বেশী না পাইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আমার স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা করিবার অধিকার থাকায় এই চাকুরী গ্রহণে আমার আপত্তির কোন কারণ ছিল না।

নন্দনগাছি স্থানটি তেমন প্রাচীন কিম্বা বৃহৎ নহে, চৌধুরীদের দিয়াই এখানে যা কিছু ধুমধাম, তাঁহাদের একটা মাইনর স্কুল ও একটা ডাক্তারখানা আছে, নদী নিকটে এবং বাজারে সকল রকম জিনিষই পাওয়া যায়, এই সকল কারণে এখানে ভদ্র লোকের বাসের বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। জমীদার বাড়ী নিত্য নিয়মিত দর্শন দিয়া, হাঁসপাতালে রোগীর নাড়ী টিপিয়া ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যে কিছু সময় বাঁচিত তাহা আমি আমার নির্জ্জন দ্বিতল কক্ষটিতে সাহিত্য চর্চ্চাতেই ক্ষেপণ করিতাম, জরুরী ডাক না পড়িলে আর মনীব বাড়ীর

দিকে বড় একটা ঘেঁসিতাম না, কারণ বাল্যকাল হইতেই আমার এই রকম একটা ধারণা আছে, যে জল ও তেলের মত জমীদারপুঙ্গবদের সঙ্গে চাকরীজীবী আমাদের কখন মিল হইতে পারে না, লঘু আমরা চিরদিনই উপরে ভাসি।

কিন্তু তাই বলিয়া আমার মনীব জমীদারের কোন দোষ দিতে পারি না; তাঁহারা আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। ক্ষুদ্র কিন্তু খরস্রোতা চূর্ণী নদী তীরে তাঁহাদের নিভৃত দ্বিতল বাগানবাড়ীটি এবং একটা বলিষ্ঠ, খর্ব্বকায় পেগুর টাট্টু সংযোজিত একখানি টমটম গাড়ী তাঁহারা আমার ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। "কল" আসিলে এই টমটমে চড়িয়া অনেক সময়ই আমি নন্দনগাছি হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানেও রোগী দেখিতে যাইতাম, কারণ এ অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ী নাই এবং পাল্‌কী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, সে দিন চতুর্দ্দশী কি অমাবস্যা হইবে; সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, টুপটাপ মিটিমিটি বর্ষণ নয়, মুষলধারে বারিপাত, আর অন্ধকারপূর্ণ আকাশে নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘস্তরে বিদ্যুতের দিগন্তব্যাপী বিকাশ এবং বজ্রের শ্রবণ-বিদারী নির্ঘোষ। আমার শয়ন কক্ষের পশ্চাতের

চারিটা নালা দিয়া ছাদের জল প্রপাতের মত কলকল শব্দে বাগানের রঙ্গিল কচু গাছ ও ক্রোটন শাখা পরিবৃত ইষ্টকস্তূপের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং আমি আমার বকপক্ষ-শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কি একখান খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কেন জানি না খবরের কাগজের শুষ্ক তুচ্ছ খবরগুলা কিছুতেই আমার মনোরাজ্যে স্থান পাইল না, তাহার পরিবর্ত্তে আমার মনে হইতে লাগিল:—

"এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!"

কিন্তু হায়, এই ঘন-বর্ষণ-ক্লান্ত বর্ষা-পীড়িত নির্জ্জন প্রবাসে আমি একাকী, তাই রামগিরি-নির্ব্বাসিত বিরহ-খিন্ন নিঃসঙ্গ যক্ষের হৃদয়-বেদনা অন্তরের সহিত অনুভব করিয়া আমিও কতবার মনে করিতেছিলাম:—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী জনে কিম্পুনর্দূরসংস্থে!"

আমাদের ডাক্তারদের জীবনের একটা কষ্ট এই যে রাত্রে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইবার সম্ভাবনা বড় কম, সপ্তাহের মধ্যে তিন রাত্রি উপর্য্যুপরি নির্ব্বিবাদে ঘুমাইতে পারিয়াছি নন্দনগাছিতে আসার পর এমন সৌভাগ্য হয়

নাই ; আজও এক একবার মনে হইতেছে এমন বর্ষার রাত্রে যদি কোথাও হইতে একটা “কল” আসে ত সমস্ত কবিত্ব মাটি হইয়া যাইবে। যাহারা ক্রমাগত আকাশের চাঁদ, মলয়ের হাওয়া, ফুলের গন্ধ আর প্রেমের আন্দোলন লইয়া কারবার করে, কবিত্বের খেয়াল তাহাদেরই শোভা পায়, আমরা রক্ত মাংসের শরীর লইয়া কাটাকুটি করি এবং হৃদয় অপেক্ষা দেহ যন্ত্রটার কথাই ভাল জানি, সুতরাং কবিত্ব রোগ আমাদের কাছে ঘেঁসিলেও বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না।

রাত্রি ন'টা, দশটা, এগারোটা বাজিয়া গেল, বৃষ্টির বিরাম নাই, ঝটিকাও প্রবল ; আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম।

বারোটা বাজিল, একটু ঘুম আসিয়াছে এমন সময় শুনিলাম নীচে কে যেন ডাকিতেছে, “ডাক্তার বাবু”, “ডাক্তার বাবু”,— আমি তাড়াতাড়ী উঠিয়া নীচে আসিলাম; দেখিলাম বসন্তপুরের জমীদার হরিশ গাঙ্গুলীর বাড়ী হইতে একজন অশ্বারোহী আমাকে লইতে আসিয়াছে, এখনি যাইতে হইবে, হরিশ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের কলেরা হইয়াছে!

তখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, বাতাসের বেগে বাহিরে যাওয়া দুষ্কর। বসন্তপুর নন্দনগাছি হইতে তিন ক্রোশের কম নহে, এমন রাত্রে কুকুরও ঘরের বাহির হয় না, কি করিব দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম,

কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও এমন রাত্রে বাহিরে যাইতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য কঠিন। একবার ভাবিলাম, বলিয়া দিই এমন দুর্য্যোগের মধ্যে এত রাত্রে ততদূর যাওয়া অসম্ভব, আবার তখনই একটি বিপন্ন পরিবারের উদ্বেগ ও অশান্তির কথা মনে পড়িল, বালকের পিতা হয়ত আগ্রহ ভরে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহার স্নেহময়ী জননী হয়ত রোগশয্যা প্রান্তে বসিয়া রোগক্লিষ্ট প্রাণাধিক পুত্রের জীবনাশায় হতাশ হইয়া নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন, এখন আমিই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা স্থল।— আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; কিন্তু যাইবার উপায় কি ? হরিশ বাবু ঘোড়া পাঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু একে আমি অশ্বারোহনে সুদক্ষ নহি তাহার উপর এই ভয়ানক রাত্রি এবং পিচ্ছিল মেঠোপথ, দিনের বেলা হইলেও না হয় দেখা যাইত, এমন রাত্রে এই অনভ্যস্ত অশ্বের সওয়ার হইতে আমি সাহস করিলাম না। হরিশ বাবুর অশ্বারোহীকে জানাইলাম, ঘোড়ার আবশ্যক নাই, আমি টমটমে যাইতেছি; শুনিয়া সে তাহার প্রভুকে আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য আগেই ফিরিয়া গেল।

কোচম্যানকে উঠাইয়া টমটম প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম, এত রাত্রে এই দুর্য্যোগের মধ্যেই আমি

বাহিরে যাইব শুনিয়া আমার ভৃত্যগণ অবাক্ হইয়া গেল। অনেক ডাকাডাকিতেও কোচম্যানের কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বেচারা হয়ত তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। বৃথা সময় কাটানো উচিত নহে ভাবিয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে আমি নিজেই টমটম ঠিক করিয়া লইলাম।

তাহার পর পোষাক আঁটিয়া একটা ওয়াটার প্রুফ্ গায়ে ফেলিয়া সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রতিপদে টমটমের গতি রোধ হইতে লাগিল, পথের জল কাদা ছিট্কাইয়া আমার গায়ে উঠিতে লাগিল, বৃষ্টিধারায় সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেল। অবিশ্রান্ত গাড়ী চালাইয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে আমি বসন্তপুরে হরিশবাবুর অট্টালিকার সম্মুখে পৌঁছিলাম, ইষ্টকবদ্ধ পথে টমটমের চক্রশব্দ শুনিবামাত্র একজন দ্বারবান আসিয়া দেউড়ী খুলিয়া দিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হরিশবাবু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু!"

"হাঁ, মহাশয়।"

হরিশবাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আঃ— বাঁচিয়েছেন মশায়, যে দুশ্চিন্তাতে এ ক' ঘণ্টা কাটিয়েছি তা আমিই জানি, এমন দুর্য্যোগে যে আপনি আস্তে পারবেন তা আর ভাবিনি, সন্ধ্যা হতে খোকার ভেদ আর বমি হচ্ছে, আমাদের নরসিং ডাক্তার দেখ্ছিল, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ, তার উপর

ভার দিয়ে আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারা যায় না, তাই আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিলাম, আজ আপনি আমার যে উপকার কল্লেন তা—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "বেশী বিনয় প্রকাশের আবশ্যক নেই, এ আমাদের কর্ত্তব্য কাজ, এখন চলুন আগে রোগীর কাছে যাই।"

অনতিবিলম্বে আলোকোজ্জ্বল সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে রোগীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম। হরিশবাবুর তিন বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার অনিদ্র মাতা নতনেত্রে শয্যার উপর বসিয়া আছেন, শিশুর চক্ষু মুদ্রিত, রোগযন্ত্রণায় তাহার সুন্দর মুখ খানিতে কালি পড়িয়া গিয়াছে। আমি অতি সাবধানে শিশুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, রোগের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শুনিলাম, দেখিলাম পীড়া তখনো কঠিন হয় নাই, যথাযোগ্য ঔষধির ব্যবস্থা দিয়া এবং উদ্বিগ্ন পিতা মাতাকে আশ্বস্ত হইতে বলিয়া আমি আবার নন্দনগাছি রওনা হইলাম। রাত্রিটা সেখানে থাকিয়া যাইবার জন্য হরিশবাবু খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি জানি এই রাত্রেই যদি আবার কেহ আমার খোঁজে আসে ভাবিয়া হরিশবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

বসন্তপুরে আসিবার সময় আমি নন্দনগাছি হইতে সোজাপথ ধরিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু জল বৃষ্টির জন্য পথে

অত্যন্ত কাদা হওয়াতে আর সে পথে না ফিরিয়া প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া নসরৎপুরের বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। নসরৎপুর খৃষ্টান মিসনারীদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, একজন ইংরেজ পাদরী, ইংরেজী নাম ও বাঙ্গলা উপাধিসংযুক্ত কতকগুলি দেশীয় খৃষ্টান এবং কয়েকজন বাঙ্গালী মিস্ এখানকার অধিবাসী। এখানে পাদ্রীদের একটা স্কুল, একটা গার্লস্ স্কুল ও একটা চর্চ্চ আছে।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমি নসরৎপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; তখন বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল বটে কিন্তু অন্ধকার ভয়ানক, বাতাসের বেগ তখনো মন্দীভূত হয় নাই, রাশি রাশি কৃষ্ণবর্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড বায়ু প্রবাহে অনন্ত আকাশের দূরতর প্রদেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, মোটা মোটা বৃষ্টি ধারা আমার মুখে, ওয়াটারপ্রুফে এবং ছাতার উপর আসিয়া পড়িতেছে। আমার টমটম সংলগ্ন ল্যাম্পের আলোকে চারি দিকের অন্ধকার আরো ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি মাথা তুলিলেই দেখিতে পাই সুবৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী চারিদিকে মস্তক উন্নত করিয়া বিকটাকার দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, কোন দিকে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। আমি একাকী সেই তমসাবৃত অমানিশায় সিক্তদেহে অস্বচ্ছন্দচিত্তে গৃহ লক্ষ্য করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠে আসিয়া পড়িলাম, রাস্তার বাঁ ধারে সুদীর্ঘ বিল, এক সময়ে ইহা পদ্মার 'দামস' ছিল, ডাহিনে সুবিস্তীর্ণ খড়ের ক্ষেত, বিলের ধার দিয়া মাটির বাঁধা রাস্তা, আমি সেই রাস্তায় চলিতে লাগিলাম, চলিতে চলিতে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে আসিয়া আমার গা'টা হঠাৎ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল।

এই বিলের নাম 'ঠেঙ্গামারীর বিল', আগে যখন এ অঞ্চলে দস্যুভয় ছিল তখন দস্যুদল অনেক লোককে এই বিলের ধারে ঠেঙ্গাইয়া মারিত, সেই হইতে বিলের এই নামকরণ হইয়াছে। আমি নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলাম, এই ভয়ানক স্থানের ভয়ানক স্মৃতি এতক্ষণ আমার মনে উদিত হয় নাই। এই বৃক্ষতলে আসিয়া আমার ঘোড়া একটু বিচলিত হইল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, বিলের দিক হইতে শ্বেতবর্ণ একটা কিছু আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখানে বলা বাহুল্য মেডিকেল কালেজের পাশ করা ডাক্তার আমি বহুসংখ্যক নর নারীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিয়াছি, ভূত প্রেতের ভয় কখন করি নাই এবং ভৌতিক জগৎ ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব কখন মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু এই গভীর নিশীথে, জনহীন, অন্ধকারপূর্ণ কর্দ্দমসঙ্কুল প্রান্তর পথে বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে এই দৃশ্য দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত

হইয়া পড়িলাম, আমার মনে হইল হয়ত কখনো কোন হতভাগ্য পথিক দস্যুহস্তে অসময়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহারই অশরীরী আত্মা ছায়াময় দেহ ধারণ করিয়া তাহার লুণ্ঠিত ধনের অনুসন্ধানে এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ক্রমে সেই শুভ্র ছায়া আমার অধিক নিকটে আসিলে আমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া দেখিলাম সত্য সত্যই রক্ত মাংসের শরীরবিশিষ্ট একটি মনুষ্য, দীর্ঘ দেহ, মুখে প্রচুর শ্মশ্রু ও গুম্ফ বর্ত্তমান, মস্তকের কেশ দীর্ঘ এবং রুক্ষ, একখানি শুভ্র চাদরে সর্ব্বশরীর আবৃত, বৃষ্টিতে উত্তরীয় ও পরিধানবস্ত্র সিক্ত, স্থানে স্থানে কর্দ্দমাক্ত। আমি সবিস্ময়ে এই অপরূপ আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার গাড়ীর ল্যাম্পের আলো তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছিল, বোধ হয় সেই তীব্র আলোক তাহার চক্ষে অসহ্য হইতে ছিল, তাই চক্ষের উপর করতল প্রসারিত করিয়া সে আমার দিকে চাহিতে লাগিল।

আমি ভাবিলাম এখন আমার কর্ত্তব্য কি? ভয়ের প্রথম আক্রমণ চলিয়া গিয়াছে, এখন ভয়ের সঙ্গে কৌতূহল, উদ্বেগের সঙ্গে চাঞ্চল্য আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল, মনে হইল লোকের মুখে কত দিন হয়ত এই পথিকের গল্পই শুনিয়াছি, দিবসে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু গভীর নিশীথে এই অঞ্চলের অনেক লোক তাহাকে দেখিয়া ভীতচিত্তে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে; গল্পের

গাড়ীর গাড়োয়ানেরা গভীর রাত্রে গাড়ীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছে, হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখে সম্মুখে একজন ভদ্রলোক, কোথা হইতে আসিতেছে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না। পথের ধারে দোকানের পাশে গ্রাম্য কুকুরগুলা ঘুমাইয়া থাকে, কখন কখন তাহাদের পাশ দিয়া একজন লোককে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চীৎকার শব্দে তাহারা স্তব্ধ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। দোকানদারগণ কত দিন দোকানের ঝাঁপ ঈষৎ অপসারিত করিয়া দেখিয়াছে সেই এক নির্ব্বাক দীর্ঘমূর্ত্তি ! ভয়ে তাহারা রাম নাম স্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অর্গল রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বা রাত্রি শেষে নির্জ্জন মাঠে কত দিন অস্পষ্ট অথচ অতি করুণ রোদনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়,কেহ যেন গভীর দুঃখে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, যেন কোন সুখ শান্তিহীন অনুতাপদগ্ধ প্রেত তাহার সমাধী ভেদ করিয়া উঠিয়া অশ্রু প্রবাহে ধরা-তল সিক্ত করিতেছে। এত রুদ্ধ যন্ত্রণা কাহার ? এই অপরূপ পথিক কে ?—আমি সন্দেহাকুলিত চক্ষে আগন্তুকের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি সেই ? মানুষ না ভূত ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষই হোক আর ভূতই হোক অবশেষে আগন্তুক কথা কহিল; নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, নন্দনগাছি কোন পথে যাইব অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন।"

আমি কি উত্তর দিব প্রথমে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না, ভূতে কি এমন ভদ্রভাবে কথা বলিতে পারে? কিন্তু এত রাত্রে এরূপ দুর্য্যোগের মধ্যে নন্দনগাছির পথ জিজ্ঞাসা করে এমন মানুষ যে বিশ্বসংসারে আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না,—তাহা হইলে কি এ ব্যক্তি উন্মাদ?

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "এখান হইতে সোজা দক্ষিণ মুখে যাইতে হইবে, কিন্তু এত রাত্রে এই দুর্য্যোগের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আপনার নন্দনগাছি যাওয়ার এমন কি আবশ্যক বুঝিতে পারিলাম না।"

আগন্তুক অসহিষ্ণু ভাবে উভয় হস্ত নিপীড়ন করিয়া বলিল, "আবশ্যক আছে, বিশেষ দরকার বলিয়াই যাইতেছি; সম্মুখের পথ ধরিয়া চলিয়া যাই?"—পথিক আর একবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল।

তাহার বিপদ কি জানি না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া তাহার প্রতি আমার মনে অনেকখানি সহানুভূতির সঞ্চার

হইল, বোধ হইল লোকটা বড় বিপদে পড়িয়াছে, এখন আমি তাহার কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি ; প্রকাশ্যে বলিলাম, "আমি নন্দনগাছি যাইতেছি, ইচ্ছা করিলে আপনি আমার গাড়ীতে উঠিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন।"

আগন্তুক কিছুমাত্র ইতঃস্তত না করিয়া আগ্রহ ভরে আমার টমটমের পাদানের কাছে আসিল, কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "মহাশয়, আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন, আপনার উপকার কখন ভুলিব না, আমি অতি হতভাগ্য।"—তাহার পর সে টমটমে উঠিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

পথিক তাহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলের উপর উভয় হস্ত সংলগ্ন করিয়া সেই নৈশ অন্ধকারের দিকে স্থির দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল ; সে আপনার চিন্তাতেই বিভোর, আমি একজন লোক যে তাহার পাশে বসিয়া রহিয়াছি, তাহার মুখে মাথায় যে ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, সেদিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না, আমি তাহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। সবিস্ময়ে, সন্দিগ্ধচিত্তে চাহিয়া দেখিলাম সে নির্ব্বাক, অচঞ্চল, পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছে। আমি মনে মনে ভারি একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম, দুই একবার আমার

এমনও মনে হইল যে এই আপদটাকে গাড়ীর উপর তুলিয়া লইয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!

অনেকক্ষণ পরে পথিক হঠাৎ আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নিবাস কি নন্দনগাছি?"

"নিবাস আমার অন্যত্র, বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আমি নন্দনগাছি থাকি।"

"মহাশয় এমন রাত্রে পথে চলিতেছেন, ইহা বিস্ময়কর বটে!"

"দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারদের পক্ষে এরূপ রাত্রে ঘরের বাহির হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে"—আমি এই উত্তর দিলাম; কিন্তু আমি ডাক্তার, এই কথা শুনিয়াই আমার সহযাত্রী হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল, তাহার পর সবেগে উভয় হস্তে আমার হস্তস্থিত লাগাম চাপিয়া ধরিয়া আমার দিকে চাহিয়া অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

"ডাক্তার, মহাশয় কি ডাক্তার!"

আমি তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ অনুমান করিতে পারিলাম না, লোকটার কথাবার্ত্তা ক্রমেই আমার নিকট প্রহেলিকার মত রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে, বিস্ময় দমন করিয়া উত্তর দিলাম, "হাঁ।"

আগন্তুক সবেগে বলিল, "আশ্চর্য্য! মহাশয়, এত রাত্রে আমি ডাক্তারের খোঁজেই নন্দনগাছি যাইতেছি,

আপনি দয়া করিয়া অবিলম্বে আমার গৃহে চলুন, এখান হইতে আপনাকে দেড় ক্রোশের বেশী যাইতে হইবে না, নসরৎপুরের প্রান্তভাগে আমার বাড়ী, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছিতে পারিব।”

আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, কিন্তু ধীরভাবে বলিলাম, “কাহারো কি কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে ?”

“অতি কঠিন, মহাশয়, অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন, আপনি গাড়ী ঘুরাইয়া দেন।”

“কি পীড়া জানিতে ইচ্ছা করি।”

পথিক আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কোন কথা না বলিয়াই সহসা দুই হস্তে উভয় চক্ষু আচ্ছাদন পূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিল, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই ঘনঘোরনিশীথে নির্জ্জন অপরিচিত পথে আমার পার্শ্বে বসিয়া একজন অপরিচিত পথিককে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া আমি বড় বিচলিত হইলাম, সবিস্ময়ে, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ব্যাপার কি, মহাশয়, খুলিয়া বলুন, বিপদের সময় অধীরভাবে ক্রন্দন করা শুধু স্ত্রীলোকেরই শোভা পায়।”

আমার সহযাত্রী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, “আমার বড় বিপদ, আর কাল নষ্ট করিবেন না।”

প্রকৃত ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি গাড়ী ঘুরাইয়া দিলাম। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়িতেই সে প্রাণপণ শক্তিতে মেঠোপথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমার সহযাত্রী বলিল, "আর বেশী দূর নাই, বামের ঐ রাস্তা ধরিয়া সোজা চলুন।"

আমি বিনা প্রতিবাদে তাহাই করিলাম। দেখিলাম দুই দিকে গাছের সারি, কি গাছ অন্ধকারের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম না, অদূরে দুইটি প্রকাণ্ড ঝাউ গাছ, তাহাদের শাখা পত্র বায়ু প্রবাহে শন্ শন্ শব্দে আন্দোলিত হইতেছে, চক্রশব্দে বুঝিলাম গাড়ী মেঠোপথ ছাড়িয়া ইষ্টকবদ্ধ পথে চলিয়াছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গাড়ীর গতিরোধ হইল।

আমার সহযাত্রী গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে নামিবার জন্য অনুরোধ করিল, আমি তাহার অনুগমন করিলাম। সে একটা চাবি বাহির করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল, কেরোসিনের নির্ব্বাণপ্রায় আলোকে দেখিলাম আমরা একটি অতি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু আলোকের অল্পতার জন্য গৃহস্থ সকল দ্রব্য ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না।

আগন্তুক, জানি না গৃহস্বামী কি না, ল্যাম্পের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত কক্ষটি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিলাম

ধনীর গৃহ বটে ; গৃহপ্রাচীরে সুন্দর তৈলচিত্র, কোন খানায় পুষ্পকাননে কুসুমচয়নরতা সুন্দরী যুবতী, তাহার গোলাপী গণ্ডস্থল এবং নিটোল যৌবন অটুট স্বাস্থ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে ; কোন খানিতে বিলাতি শিকারের দৃশ্য, লাল পোষাক পরা, প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়া, দুই তিন জন শিকারী, হস্তে দীর্ঘ বল্লম, পশ্চাতে এক দল হাউণ্ড ও টেরিয়ার, পাশে বঙ্কিম গিরিনদী, দূরে ঘন বন ; এক পাশে এক খানা কাসেলের চিত্র ; উন্নত, ধূসর পর্ব্বত গাত্রে একটা সেকেলে দূর্গ, পর্ব্বতের উপরে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, অস্তমিত সূর্য্যের লোহিত কিরণ সম্পাতে মেঘগুলি সুরঞ্জিত, পর্ব্বতের পাদ দেশে উইলো গাছের সারি, নিম্নে নতমুখী ভায়োলেট ফুল ক্ষীণ বৃন্তে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে। তৈলচিত্র গুলির নীচে হরিণশৃঙ্গশোভিত ব্র্যাকেটের উপর কৃষ্ণনগরের সুন্দর সুন্দর পুতুল, নানাবিধ কৃত্রিম ফল। ম্যাটিং করা ফ্লোরের উপর সোফা, ইজি চেয়ার, স্প্রিংএর গদিবিশিষ্ট সুদৃশ্য চেয়ার সুচারুরূপে সজ্জিত, মধ্যস্থলে সুবিস্তীর্ণ মেহগ্নি টেবিল, তাহার উপর মূল্যবান টেবিল ক্লথ বিলম্বিত, প্রত্যেক কোণে এক একটা সেল্‌ফ, তাহার উপর স্তরে স্তরে ব্যাঘ্র, বন্যবরাহের বিকট দন্ত-সঙ্কুল মস্তক। দেয়ালের স্থানে স্থানে সলাঙ্গুল ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা দীঘ মৃগচর্ম্ম প্রসারিত, তাহাদের পাশে মার্টিনী হেনরীর রাইফেল, রডার শিকারী বন্দুক, দীঘ তরবারি এবং তীক্ষ্ণধার ভুজালিয়া ও ভোটানী

ছোরা অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত। আমি সবিস্ময়ে গৃহ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; পল্লী অঞ্চলে যে কোন বাঙ্গালীর এমন সুসজ্জিত গৃহ থাকিতে পারে এরূপ আমার ধারণা ছিল না, কোন সাহেবের বাড়ীতে যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তাহাও বুঝিতে পারিলাম না, আমার সহযাত্রীই কি গৃহস্বামী?—তাহা হইলে তাহার এ অবস্থা কেন? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় টেবিলের উপর রক্ষিত একটা ক্রনোমেটার হইতে ঠং ঠং ঠং করিয়া তিনটে বাজিয়া গেল।

রাত্রি তিনটে বাজিয়া গেল, তাহা হইলে দেখিতেছি আজ সমস্ত রাত্রিই জাগিতে হইবে ভাবিয়া আমি গৃহসজ্জা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম। সহসা আমার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া তাহার গুরুতর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম; তাহার মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, উভয় হস্ত পরস্পর নিষ্পেষিত করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চারি ধারে চাহিতে চাহিতে সে গৃহ মধ্যে পাদচারণ করিতেছে, কদাচিৎ একবার থামিতেছে, আবার তখনি ত্রস্ত ভাবে পদক্ষেপ করিতেছে, যেন কি এক গভীর চিন্তায় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন, যেন তাহার হৃদয়ের অন্ধকারের সহিত মেঘমণ্ডিত, ঝটিকাসংক্ষুব্ধ বাহ্য প্রকৃতির এই নৈশ অন্ধকারের তুলনা হয় না।

কি করিতে হইবে, রোগী কোথায় এবং কি রোগ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলাম, অনেকক্ষণ পরে আমি কিঞ্চিৎ সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, যদি আমাকে রোগীর কাছে লইয়া যান—" কথা শেষ না হইতেই আমার সঙ্গী আমার সম্মুখে আসিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইল, এবং আমার মুখের উপর অবিচল কঠোর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক আবেগ ভরে উত্তর করিল, "রোগী, রোগীকে দেখিতে চান?—ডাক্তার, আমিই রোগী, আমি অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছি, আমাকে ভূতে পাইয়াছে, ডাক্তার বাবু, আমাকে ঔষধ দেন, আমাকে বাঁচান।"—সহসা সে দুই হস্তে আমার মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিয়া আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই তৃতীয় প্রহর রাত্রে অপরিচিত স্থানে, একটি আলোক উদ্ভাসিত সুসজ্জিত কক্ষে এক অদ্ভুদ রোগী—এমন রোগ জন্মাবচ্ছিন্নে আমি যাহার চিকিৎসা করি নাই, আর একটি ত্রস্ত, সঙ্কুচিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিকিৎসক; আমার অভিজ্ঞতায় এমন শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আর কখন পড়ি নাই। এ কি প্রহেলিকা! এ কি সত্য নহে? আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া আমার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার মুখ হইতে কোন কথাই নির্গত হইল না।

কিন্তু কি বিপদ, সে আমার হাতও ছাড়ে না, তাহার ক্রন্দনেরও বিরাম নাই; অবশেষে একটা সোফায় বসিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া সে অবনত মস্তকে কাঁদিতে লাগিল; বাহিরে শন্ শন্ করিয়া বেগে বাতাস বহিতেছে, ঝর ঝর

শব্দে বৃষ্টিধারা ঝরিতেছে, এক এক বার কড় কড় বজ্রনাদ শুনা যাইতেছে, ঘরে ঘড়ীতে সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ডের টক্ টক্ শব্দ, দুয়ার জানালাগুলা দুম্‌দাম্ করিয়া বন্দ হইতেছে খুলিতেছে, এই সকল বিশৃঙ্খল শব্দের সহিত আমার সহযাত্রীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি মিশিয়া আমার চতুর্দ্দিকে প্রেত লোকের একটা প্লুত রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

জোরে জোরে আমার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল; তাহার দৃষ্টি কি ভয়ানক, সেই কুটিল, ঘূর্ণিত, রক্তাক্ত নেত্রের স্থির দৃষ্টি আমাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল!—সে কত দিনের কথা, কিন্তু মনে হইতেছে সে কাণ্ড যেন কাল ঘটিয়া গিয়াছে, আমি আতঙ্কে চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম।

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সেই অদ্ভুত রোগী আবার গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিল, "ডাক্তার বাবু, আমি মিথ্যা কথা বলি নাই, আমার কথা সত্য, অতি ভয়ানক সত্য; আমার বুকের মধ্যে যে কথা লুকান আছে তাহা আজীবন গোপনে রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; আমার বুক ফাটিয়া যাই-তেছে, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, তাই আমাকে আজ সকল কথা প্রকাশ করিতে হইবে। হায়, যদি আমার এ দগ্ধ স্মৃতি বিলুপ্ত হইত তাহা হইলেও আমি শান্তি পাইতাম, কিন্তু তাহা হইবার নহে, নিশিদিন আমাকে অসহ্য যাতনা

ভোগ করিতে হইবে। আপনি স্থিরভাবে আমার কথা শুনুন, আমার রোগ কি বুঝিতে পারিবেন, তাহার পর আমি কিরূপে আরোগ্যলাভ করিব বলিয়া দিন, আমাকে রক্ষা করুন।"

আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া পুনর্ব্বার সে বলিল, "আমি আপনার কাছে কোন কথা গোপন করিব না, আমাকে আমার নিজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে, আমি জানি সে সকল কথা প্রকাশ করিলে আমার অপরাধের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তথাপি আমি সকল কথা খুলিয়া বলিব, পৃথিবীতে মনুষ্যনির্দ্দিষ্ট কোন কঠিন দণ্ডকেই আমি ভয় করি না, বিধিনির্দ্দিষ্ট দণ্ডের ন্যায় তাহা কঠোর হইতে পারে না। আপনি ঐ চেয়ারখানায় বসুন।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার পার্শ্ববর্ত্তী একখান চেয়ারে উপবেশন করিলাম, আমার রোগী তাহার জীবনের বিচিত্র ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"আমার পিতা শশাঙ্কশেখর সিংহ জমীদারের ছেলে ছিলেন; শ্রীরামপুরে তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। পিতামহ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টিয়ান মিসনারী দিগের সহবাসে আমার পিতার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ছিল, তিনি—জানি না কোন প্রলোভনের বশে কি ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুরোধে, জর্ডনের জল মাথায় দিয়া একদিন প্রভু যিশুর মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। পিতামহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরের বেশী নহে।

একাল হইলে হয়ত তিনি টমাস বিশ্বাস বা দানিয়েল রাহার মত কোন বিলাতী রেভারেণ্ডের সহকারী হইয়া বিশ টাকা বেতনে জীবন কাটাইতেন, এবং রথ বা দোল উপলক্ষে কোন একটা গাছতলায়, কিম্বা জনপূর্ণ হাটের মধ্যে দাঁড়াইয়া হিন্দু দেব দেবীর নিন্দা প্রচার পূর্ব্বক খৃষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বৃদ্ধিতে মনঃসংযোগ করিতেন, কিন্তু সেকালে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক সাহেবরা নেটিভ কনভার্ট দিগকে একাল অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ করিতেন; আমার পিতামহ বাবাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলে তিনি রেভারেণ্ড কেরীর করুণায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কমিসারিয়েটের মধ্যে একটা ভাল চাকরী পাইলেন।

বাবা কত দিন এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যতদিন প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিবেন ততদিন বিবাহ করিবেন না! অনেক বয়স হইলে এবং হস্তে উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হওয়ার পর তিনি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশপ্রবাসী একজন বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করেন; কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না, এই বিবাহের অল্প দিন পরে, আমার প্রায় এক বৎসর বয়সের সময় আমার মায়ের সহিত পিতার গুরুতর মনোবিবাদ উপস্থিত হয়, মা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন; ইহার অল্পকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আমার প্রতিপালন ভার আমার পিতার দাস দাসীগণের হস্তে পতিত হইল।

কিন্তু পরমেশ্বরের অভিশাপের মধ্যে আমার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, আমার জন্মনক্ষত্র আমাকে হতভাগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, আমার প্রতি আমার পিতার বিন্দু মাত্রও স্নেহ ছিল না, অথবা থাকিলেও কোন দিন আমি তাহা অনুভব করিতে পারি নাই; মাতৃহীন বালকের পক্ষে পিতৃ স্নেহের অভাব অতি শোচনীয়। স্নেহহীন, সুখহীন হইয়া আমার বাল্যজীবন শুধু একটা নিরাশার হাহাকারে, তীব্র হৃদয়বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পথের কুক্কুর ও আমার মধ্যে যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না।

ক্রমে আমি যত বড় হইতে লাগিলাম ততই পিতার বিরক্তিভাজন হইয়া উঠিলাম, তিনি আমাকে সম্মুখে দেখিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন; কেন, আমি তাঁহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহা তিনিই বলিতে পারিতেন, কিন্তু সেই সময় হইতে আমার অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। সংসারে যে ব্যক্তি কাহারো স্নেহ প্রেম না পায়, যে কাহাকেও ভালবাসিতে না পারে, সে ক্রমে বন্য জন্তুর ন্যায় হৃদয়হীন ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, জগতের স্নেহ প্রেম বঞ্চিত আমি ভয়ানক স্বার্থপর, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলাম, গৃহস্থ দাস দাসীবর্গ সকলেই আমার ভয়ে সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকিত।

বাবার বয়স হইয়াছিল, তিনি চাকরী ছাড়িয়া দেশে চলিয়া আসিলেন, আমাকে একবারও ডাকিলেন না; আমার অভিমান করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, আমি দেশে না আসিয়া কমিসারিয়েট বিভাগে বাবার এক মুরুব্বি সাহেবের অধীনে একটা চাকরী লইয়া মীরটে থাকিলাম। তখন আমার বয়স মোটে সতের বৎসর, কিন্তু আমাকে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকের মত দেখাইত! ডাক্তার, আমার শত অত্যাচারে ও অনিয়মে জর্জ্জরিত, এই জীর্ণ, দুর্ব্বল, ভগ্নদেহ দিয়া আমার সে সময়ের সেই দৃপ্তযৌবনের দুর্জ্জয় সামর্থ্যের কথা আজ তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাবার বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন হইয়াছিল ; বড় বড় যুদ্ধ বিদ্রোহে কমিসেরিয়েটের আমলাদের মাথা যাওয়ার সম্ভাবনা যতটা বেশী, মাথাটা কোন রকমে বজায় রাখিতে পারিলে লাভও সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। খৃষ্টিয়ান হইলেও তিনি পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিয়দংশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার পর স্বোপার্জ্জিত অর্থও নিতান্ত অল্প ছিল না, ব্যবসায় কার্য্য একরকম ভালই বুঝিতেন ; ব্যবসায়ের দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবেন, দেশে আসিয়া এই সংকল্প স্থির করিলেন।

নীলের ব্যবসায়ে যেমন লাভ এ প্রকার লাভ এ সময়ে আর কোন ব্যবসায়েই ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে বাবা 'র‍্যামজে এণ্ডারসন' কোম্পানীর কয়েকটা নীলের কুঠী সুবিধামত দরে কিনিতে পাইলেন। সেই সকল কুঠীর মধ্যে এই নসরৎপুরের কুঠী অন্যতম।

কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলাম পিতার মৃত্যু হইয়াছে। আমিই তাঁহার একমাত্র বংশধর, জীবিত অবস্থায় আমার প্রতি তাঁহার যতই উপেক্ষা থাক, তাঁহার মৃত্যুর পর আমিই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলাম। পিতার মৃত্যুর পর একবার দেশে আসিয়া আমি বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফিরিয়া গেলাম। চাকরীর আবশ্যক ছিল না, এখন আমারই অর্থ খাইবার লোক নাই, আমি চাকরী ছাড়িয়া বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ

করিতে লাগিলাম। এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই, জীবনের প্রতিও তেমন মমতা ছিল না, তাহার উপর অর্থ এবং অবসরের অভাব নাই সুতরাং শুধু আমোদ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। এই সময় আমার শিকারের ঝোঁক বড় প্রবল হইয়াছিল, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে মিলিয়া অরণ্যে অরণ্যে কত বাঘ, ভালুক, হরিণ, বরাহ শিকার করিয়াছি, কতবার আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই; এই কক্ষেও আমার শিকারপ্রিয়তার চিহ্ন বর্ত্তমান দেখিতেছ,— এই কক্ষস্থিত ব্যাঘ্র হরিণ, বরাহের পুঞ্জীকৃত মস্তক আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল। যৌবন ও অর্থবলে আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম না, এ বিপুল বিশ্বে কোথাও আমার বন্ধন ছিল না, এই মুক্ত জীবনের স্বাধীনতা আমি পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছি; অনেকে আমাকে ভয় ও ঘৃণা করিত, অতি অল্প লোকেই আমাকে ভাল বাসিত, কিন্তু ঘৃণা বা স্নেহ কিছুতেই আমি কোন দিন বিচলিত হই নাই। আমার সেই স্বাধীন মুক্তজীবনের কথা আমার নিকট এখন উপকথা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অসময়ে অনুতাপ করা নিষ্ফল।

মনে পড়ে একবার শীতকালে আমি আগরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বড়দিন উপলক্ষে তখন আগরাতে

আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল; সে সময় ফরাসী দেশ হইতে এক 'সার্কাস' কোম্পানী আগরাতে খেলা দেখাইতে আসিয়াছিল। আমি বন্ধুবর্গের সহিত একদিন 'সার্কাস' দেখিতে চলিলাম।

সার্কাসের 'রিং'এর চতুষ্পার্শ্ব লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান মহিলা সে সময় আগরাতে যতগুলি ছিলেন, সেদিন সেখানে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন; আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, মহিলাদিগের আসন সেখান হইতে দূরে নহে।

হঠাৎ অদূরবর্ত্তী 'বক্সের' উপর উপবিষ্টা একটি যুবতীর প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইল, এমন সুন্দরী আমি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। যুবতীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে, সুরচিত দীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি অনিন্দ্যসুন্দর এবং কোমল দৃষ্টিপূর্ণ আয়ত চক্ষু দুটি সরোবরের নীল জলে প্রস্ফুটিত উৎপলের ন্যায় উদ্ভাসিত, তাহার প্রফুল্ল অটুট গণ্ডস্থলের রক্তিমাভা কি মনোরম! কৃষ্ণবর্ণ বঙ্কিম ভ্রূ যেন বিধাতার অতুলনীয় তুলিকার কমনীয় সৃষ্টি। যুবতী একটা অতি সূক্ষ্ম ওড়নায় তাহার বিকশিত, সুপক্ক আঙ্গুরের ন্যায় রসমাধুর্য্য পরিপূর্ণ, সুগোল তনুখানি আবৃত করিয়া ক্রীড়া কৌশল নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু পুরুষগণের দৃষ্টি

সার্কাসের দিকে ছিল না. এই যুবতীর প্রতিই সকলে বদ্ধদৃষ্টি! রমণী এক এক বার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দর্শকগণের এই পুরুষ-সুলভ সঙ্কোচশূন্য কৌতুকতরঙ্গিত দৃষ্টির তাড়নায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল। ডাক্তার, রমণীর সেই ব্রীড়াবিমণ্ডিত, যৌবনমহিমাস্ফুরিত মুখভাবের মুহুঃ-পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার উচ্ছৃঙ্খল, চপলচিত্তে এমন মোহের সঞ্চার হইয়াছিল যে আমার কতবার মনে হইতে-ছিল এ যুবতী বুঝি মানবী নহে।

সহসা একটা ভয়ানক বিভ্রাটে চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সার্কাসের একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া কি কারণে ক্ষেপিয়া উঠিল, সে তাহার আরোহীকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া 'রিং'এর বাহিরে লাফাইয়া আসিল, দর্শকেরা যে যে দিকে পারিল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, অনেকে পরস্পরের ঘাড়ে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। আমি চক্ষের নিমিষে দেখিলাম যেদিকে রমণীগণের বসিবার আসন, উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব উর্দ্ধ মুখে সেই দিকে ধাবিত হইয়াছে। আমি উপরে যে যুবতীর কথা বলিয়াছি সে তখন ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, অনেকে পলাইয়া গেল, কিন্তু তাহার গতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, দেখিলাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনো সে আসনের উপর বসিয়া আছে; অশ্ব আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাহাকে দংশনোদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে

পারিলাম না, রমণীকে রক্ষা করিবার জন্য একটি প্রাণীকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া রাগে ও ঘৃণায় আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিন লম্ফে আমি সেই ভয়কম্পিতা, বিহ্বলা যুবতী ও দংশনোন্মুখ ক্ষিপ্ত অশ্বের মধ্যে গিয়া পড়িলাম এবং বামকক্ষে মূর্চ্ছিতপ্রায় রমণীকে তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ভীমবেগে অশ্বের মুখে আঘাত করিলাম। অশ্ব একবার মুখ ফিরাইয়া লইল কিন্তু পর মুহূর্ত্তে, আমি আত্মরক্ষার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই, সে আমার দক্ষিণ বাহুমূলে সজোরে দংশন করিল, অবিলম্বে রমণীর আত্মীয়গণ শশব্যস্তে আমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে দূরে লইয়া গেল। নিদারুণ দংশন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমি সংজ্ঞাশূন্য ভাবে ভূপতিত হইলাম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"চেতনালাভ করিয়া দেখিলাম ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাধিতেছে, আর সেই চারুহাসিনী রমণীরত্ন ম্লানমুখে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, প্রথমে চক্ষু খুলিয়াই ভাবিলাম বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার পর বুঝিলাম এ স্বপ্ন নহে, সত্য। একবার আমার বেদনাক্লিষ্ট, অলস, বিহ্বল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিলাম, যুবতীর অশ্রু তরল বিশাল চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, ইহা প্রেমের মোহ না কৃতজ্ঞতার বিকাশ!—বুঝিতে পারিলাম না, সে সামর্থ্যও তখন আমার ছিল না, কিন্তু আমার হৃদয়ের মধ্যে দ্রুতস্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার ধমনী সমূহ হইতে শরীরের সমস্ত শোনিত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহার চন্ চন্ শব্দ যেন আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হইলে, রমণী অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সবিনয়ে বলিল, "আজ আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমার জীবনদাতাকে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না, আজীবন আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"—ডাক্তার, এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি জীবনে

কখন শুনি নাই, আজি বুঝিলাম আমার জীবনের পঁচিশ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয় নাই, আমার শুষ্ক, মরুময়, নিরাশ জীবনের সম্মুখে টল টল জলপূর্ণ, স্ফটিকবিমল, স্বচ্ছ সরোবর দেখিতে পাইলাম, ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম, পরমেশ্বর সাধুকার্য্যের সহায়, বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ধন্যবাদের আবশ্যক নাই।"—রমণীর মুখ লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিল, আর অধিক কথা না বলিয়া আমার বাসার সন্ধান জানিয়া লইয়া আত্মীয়গণের সহিত সে বিদায় গ্রহণ করিল। বন্ধুবর্গের সহিত বহু কষ্টে আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া আমার খুব জ্বর হইল, জ্বরের ঘোরে আমি নাকি সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিয়াছিলাম! পর দিন প্রভাতে আমার কক্ষে সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িলে আমি জাগিয়া উঠিলাম, জ্বর তখন ছিল না, কিন্তু সর্ব্বশরীরে ভয়ানক বেদনা; সে বেদনার প্রতি আজ কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই; রোগশয্যায় শুইয়া শুধু একখানি সুন্দর মুখ আমার মনে পড়িতে লাগিল, আমার জীবনের সমস্ত চিন্তা আজ তাহারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত।— সে আর কেহ নয়, পুষ্প; রাত্রে বন্ধুগণ আমার প্রলাপের মধ্যে তাহারই নাম পুনঃ পুনঃ আমার মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিলেন। পুষ্প আমার কে?—কেহ নয়, কিন্তু কেন জানি না, সে আজ আমার অন্তরের অন্তরতম হইয়া পড়িয়াছে। হায় প্রেম, কবির

কল্পনা এবং মোহের ছলনা বলিয়া কত দিন আমি তোমার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছি! কিন্তু তখন জানিতাম না,

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরাপড়ে কে জানে!
গরব সব হায়—কখন্ টুটে যায়
সলিল ব'হে যায় নয়নে!"

বেলা একটু বেশী হইলে, আমার কর্ণে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ প্রবেশ করিল।—না জানি কে আমাকে দেখিতে আসিতেছে ভাবিয়া আমি দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম একটি অপরিচিতা বর্ষীয়সী রমণী, অনুমানে বোধ হইল তিনি 'মিস্', আর আমার সেই "সব সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন" পুষ্প আমার গৃহকক্ষে প্রবেশ করিল! তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি অতি কষ্টে মাথা তুলিলাম। আমার এই আগ্রহাতিশয্যে পুষ্প কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, "উঠিবেন না, আপনার কষ্ট হইবে", বলিয়া সে একেবারে আমার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আমি চুপ করিয়া রহিলাম, একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখেরদিকে চাহিলাম, পাছে অসভ্যতা প্রকাশ হয় ভাবিয়া আবার তখনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম। পুষ্প তাহার কুসুমকোমল হাত দু'খানিতে আমার ক্ষতহস্ত ধরিয়া 'ব্যাণ্ডেজ' পরীক্ষা করিতে লাগিল, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অভাগিনী আমি আমার জন্য আপনি বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছেন, বেদনা

কি বড় বেশী ?"— আমি তাহার বাহুমূলে আমার ক্ষতহস্ত রক্ষা করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, "এই সুখের জন্য আমি ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বেদনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, এ কি বেদনা !" কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলিলাম না। ডাক্তার, ব্যাঘ্র শিকারে আমি তিন বার আহত হইয়া ইতিপূর্ব্বে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আহত হইয়া এত সুখ লাভ আমার ভাগ্যে কখন হয় নাই।

দশ দিন পরে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম, আমার ক্ষত শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন আমি গৃহের বাহির হইতে সক্ষম হইলাম, সেই দিনই বৈকালে পুষ্পের সঙ্গে দেখা করিলাম, সে সহাস্য মুখে, প্রফুল্ল অন্তরে আমার অভ্যর্থনা করিল, এবং আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার ক্ষত পরীক্ষা পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু তাহার নিকট হইতে আসিয়া আমার সকলই শূন্য বোধ হইতে লাগিল, গৃহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ নিরানন্দময় হইয়া উঠিল, বুঝিলাম এই রমণীকে না পাইলে আমার জীবনে কোন সুখ নাই। সুখহীন, শান্তিহীন, দুর্ব্বহ জীবন লইয়া আপনার অন্ধ উন্মত্ততার ছায়ার মত আমি এত কাল পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কাহাকেও ভালবাসি নাই, কোথাও আশ্রয় পাই নাই, কেহ কখন সস্নেহে আমার মুখের দিকে চাহে নাই। কিন্তু আজ রোগশয্যা হইতে

উঠিয়া সংসারে পদক্ষেপণ করিয়াই দেখিলাম সমস্ত ধরণী নবীন গৌরবে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, এ যেন মসীমলিন, চিরপুরাতন, প্রতিদিনের অভ্যস্ত, অশান্তিকল্লোলিত জীর্ণ বসুন্ধরা নহে, আমি ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে কবিত্ব, বর্ণে বর্ণে অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা, প্রতি শব্দে আনন্দহিল্লোলিত গীত ঝঙ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। বর্ষার প্রবল বন্যায় যেমন প্রবাহিনী কুলে কুলে ভরিয়া উঠে তেমনি বিশ্বপ্লাবিনী প্রেমের বিপুল আবেগে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

এক দিন যমুনাতটে নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন বট মূলে শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া পুষ্পকে কত প্রেমের কথা বলিলাম ; শুনিলাম সে বড় হতভাগিণী, পৃথিবীতে আপনার বলিতে এক ভাই ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, তাহার ভাই লাহোর কোন মার্চেণ্ট আফিসে খাতাঞ্চীর কাজ করে, কিন্তু সে তাহার কোনই সম্বাদ লয় না। মিসনারী সাহেবরা পুষ্পকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন, শিক্ষা শেষ হইলে তাহাকে মিসনের কাজ করিতে হইবে।

অনেক চিন্তার পর আমি বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। পুষ্পের নিকট প্রথমে কোন উত্তর পাইলাম না, দুই দিন পরে জানিতে পারিলাম, বিবাহে তাহার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, কিন্তু মিসনারী সাহেবরা এত কাল ধরিয়া তাহার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদিগকে অনেকগুলি টাকা দিতে না পারিলে এ বিবাহ হওয়া অসম্ভব।

টাকা! তুচ্ছ টাকাকে আমি গ্রাহ্যও করি না। সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া যদি এ দুর্ল্লভ রত্ন লাভ হয় তাহাতেও আমার আপত্তি ছিল না; যত টাকা লাগে দিয়া আমি পুষ্পকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

পুষ্পের প্রতি আমার এই অনুরাগের কথা অবিলম্বেই বন্ধুবর্গের কর্ণগোচর হইল, একটি অজ্ঞাতকুলশীলা অনাথা যুবতীকে বিবাহ করিতে যাইতেছি শুনিয়া তাঁহারা অনেকেই আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, কেহ কেহ এই কার্য্য হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি জীবনে কোন দিন কাহারো অনুরোধে কর্ণপাত করি নাই, যাহা আমার অভি-প্রেত হইয়াছে চিরদিন অসঙ্কোচে তাহাই করিয়া আসিয়াছি, আমার জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহপূর্ণ শুভকার্য্যে আমি কাহারো অনুরোধ রক্ষা করিলাম না, আমার সুতীব্র হৃদয়া-বেগেরই অনুসরণ করিলাম। মিসনারী রেভারেণ্ড ড্রুমণ্ডের কাছে এক তোড়া নোট ফেলিয়া দিয়া আগ্রাতেই পুষ্পকে যথারীতি বিবাহ করিলাম।

আগ্রায় কয়েক মাস কাটাইয়া আমি এলাহাবাদে আসিলাম, এলাহাবাদে আমাদের একটা বাড়ী ছিল, বিবাহের পর দুই বৎসর আমি সেখানে থাকিলাম। এ দুই

বৎসর যে কত সুখে আমাদের দিন কাটিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বিবাহের পর হইতে আমার জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল, সেকালে আমি যে সকল কার্য্যে আমোদ পাইতাম সে সকল কার্য্যে আর আমার কিছুমাত্র স্পৃহা রহিল না; আমার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার আমোদ প্রিয় বন্ধুগণ একে একে আমার সংশ্রব ত্যাগ করিলেন, কোষের মধ্যে তীক্ষ্ণধার কিরিচে মরিচা ধরিল, বন্দুক গুলি হতাদরে গৃহ কোণে পড়িয়া রহিল, আমার 'হণ্টিং সুট' 'ট্রঙ্কের' মধ্যে পচিতে লাগিল। আমার হৃদয়, আমার চক্ষু, আমার সর্ব্বস্ব তখন পুষ্পময়। সে ছায়ার ন্যায় আমার পাশে পাশে থাকিত, তাহাকে ধরিতে গেলে সে বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিতবেগে আমার আলিঙ্গন পাশ হইতে সরিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিত, আমি গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিলে সে স্নেহ-কোমল সহস্র চুম্বনে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত; এমনি করিয়া আমাদের দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময়ে আমার কন্যার জন্ম হয়, আমি তাহার নাম রাখিলাম "পরিমল।"

আমার কন্যার জন্মের পর মনে হইল পৃথিবীতে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই, অতুল ঐশ্বর্য্য, অটুট স্বাস্থ্য, পবিত্রতারূপিনী সাধ্বী সুন্দরী পত্নী, লোকললামভূতা কুসুমকোমল লাবণ্যবতী কন্যারত্ন— আমার আর কি অভাব আছে? আমার বাল্যজীবনের অসহ্য যাতনার পরিবর্ত্তে

বিধাতা বুঝি আমায় এত সুখ দান করিয়াছিলেন ! আমার পাষাণকঠিন হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া প্রেমতরু অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সূর্য্যের অনুকূল আলোক রশ্মি এবং হেমন্তের স্নিগ্ধ নীহার বিন্দুর ন্যায় নিত্য নব অনুরাগ সিঞ্চনে তাহা মুকুলিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন ধরাতল আচ্ছন্ন হইত এবং চরাচর হইতে একটি অব্যক্ত মিলন সঙ্গীত কর্ম্মশ্রান্ত মানবের শিথিল হৃদয়তন্ত্রী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইত, তখন এক এক দিন আমি আমার প্রিয়তমার কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার শিশু কন্যার শয্যা-প্রান্তে গিয়া উপবেশন করিতাম, মুক্ত বাতায়ন পথে মৃদু সন্ধ্যাবায়ু আসিয়া তাহার কোমল কুন্তল উড়াইয়া খেলা করিত। তাহার নিদ্রামগ্ন মুদ্রিত নয়নের উপর সুদীর্ঘ ভ্রূর অস্ফুট রেখা, তাহার লোহিতাভ ওষ্ঠাধর, সুকোমল গণ্ডস্থল আমার কল্পনামুখর নয়ন সমক্ষে আমার প্রিয়তমার শৈশব সৌন্দর্য্যের একটা মোহময় সাদৃশ্য উৎপাদন করিত; আকাশের লক্ষকোটী ক্রোশ ঊর্দ্ধ হইতে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র অনিমিষ নেত্রে সবিস্ময়ে আমার এই বিহ্বলতা নিরী-ক্ষণ করিত এবং দৈবাৎ কোন দিন আমার প্রিয়তমা অন্তরাল হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া আমার অজ্ঞাতসারে অতি ধীরে ধীরে আমার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহার প্রীতিপরিপূত গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আমাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিত।

তাহার পর সহসা এক দিন সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া

গেল। আলোক রাশি নির্ব্বাণ হইয়া নিবিড় অন্ধকারে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি সুখশৈলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে উপবেশন পূর্ব্বক জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং পূর্ণ পরিতৃপ্তি উপভোগ করিতেছিলাম, সহসা কে আমাকে পদাঘাত করিয়া বহু নিম্নে সন্দেহের অন্ধকারপূর্ণ ঘূর্ণ্যাবর্ত্তময় সাগরে নিক্ষেপ করিল। সেই দিন হইতে আমি নিজের জীবন অতি দুর্ভাগ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় আমি এলাহাবাদ ছাড়িয়া এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া সহসা আমার স্ত্রীর ব্যবহারের অনেকটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। আমার প্রতি যেন কেমন উদাসীন ভাব, আগ্রহের অভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, পূর্ব্ব স্নেহ প্রেমের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল। সেই সপ্রেম স্নেহভারাবনত দৃষ্টি, সেই সমাদরপূর্ণ সুমিষ্ট সম্ভাষণ, সেই সুপবিত্র স্নিগ্ধ মধুর হাস্য কিরূপে কোথায় চলিয়া গেল বুঝিলাম না; আমি আদর করিলে সে উপেক্ষা প্রকাশ করিত, আদর না করিলে অভিমান করিত না, অধিকাংশ সময়ই মৌনাবলম্বিনী থাকিত, যেন আমিই অপরাধী, কিন্তু অপরাধ যে কাহার তাহা বুঝিতে পারিতাম না; আমার জীবনে এমন অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল যে তাহা প্রকাশ করিবার নহে, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম, বুঝিলাম জীবনের মত আমাদের পারিবারিক সুখ শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।—

অবশেষে সত্য সত্যই বজ্রাঘাত হইল ; এক দিন প্রভাতে একখানি অপরিচিত হস্ত লিখিত পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা ছিল, "প্রিয় বন্ধু, যৌবনের মোহে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞাত কুলশীলা রূপসী যুবতীকে বিবাহ করা কিরূপ নিরাপদ, রমণীর প্রেমে একেবারে অন্ধ না হইলে, এত দিন তাহা বুঝিতে পারিতে; কবি প্রণয়ের দেবতা কিউপিড্‌কে অন্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার অর্থ কি এই যে পুরুষ তাহার প্রণয়িণীর কুক্রিয়ার প্রতিও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে ? তোমার সাধ্বী স্ত্রীর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে তোমার একজন পুরাতন বন্ধুর উপদেশ এত দিন পরে কিঞ্চিৎ মূল্যবান বলিয়া মনে হইতে পারে।"

ডাক্তার, বুঝিতেছ পত্রখানি কি তীব্র শ্লেষে পরিপূর্ণ !— পত্র পড়িয়া আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম ; কে যেন আমার উভয় চক্ষে জ্বলন্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল, সকালে আর আমার স্নানাহার হইল না ; আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলাম না। কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ? পৃথিবীতে আমার আর কে আছে ? রমণীর হৃদয় কি এতই অসার ! এমনই হীন ?— আমি কোন দিকে না চাহিয়া সেই রৌদ্রের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম ; আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি

জানি না, আমি উন্মত্তের ন্যায় একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

অপরাহ্নে পরিশ্রান্ত এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুমাত্র ছিল না, শুধু দুর্দ্দমণীয় প্রতিশোধ পিপাসায় আমার বক্ষঃস্থল জ্বলিয়া যাইতেছিল।

গৃহে ফিরিয়া পুষ্পকে কোন কথা বলিলাম না। আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; আমি সন্দেহাকুল চিত্তে তাহার চরিত্রানুসন্ধানে রত হইলাম।

এক দিন সন্ধ্যার পর দেখিলাম জ্যোৎস্নালোকিত বাগানে পুষ্করণীর সোপান প্রান্তে পুষ্প অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছে, জানি না সে তখন কাহারো প্রতীক্ষা করিতেছিল কি না, কিন্তু অবিলম্বেই ভদ্রবেশধারী একজন লোককে অতি সন্তর্পণে চোরের ন্যায় বাগানে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, অতি সাবধানে সে পুষ্পের সমীপবর্ত্তী হইল; আমার বোধ হইল তাহাকে দেখিয়া পুষ্পের মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না, অনেকক্ষণ পরে লোকটা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সে আমার নিকট দিয়াই চলিয়া গেল; তখন আমার মনের ভাব কিরূপ হইতেছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারি

তেছ, আমার ইচ্ছা হইতেছিল তরবারীর এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া পাপিষ্ঠের পাপ-পিপাশা চির জীবনের জন্য ঘুচাইয়া দিই! কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিলাম, ভাবিলাম লোকটা কে, আগে পরিচয় লই; আমার অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে কোন দিন সে প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে না।

দুই এক দিনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইলাম, শুনিলাম সে এখানকার বাঙ্গালী প্রচারক রেভারেণ্ড আর, জি, বিশ্বাসের নবাগত বন্ধু সনাতন দাস।

ইহার কয়েক দিন পরে রবিবার সায়ংকালে আমার স্ত্রী উপাসনালয়ে যাইতেছিল, পথে সনাতন দাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, আমি তখন অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম; দেখিলাম ক্ষিপ্রহস্তে সনাতন পুষ্পের হাতে কতকগুলি কাগজপত্র দিয়া একদিকে চলিয়া গেল, আমি বৃক্ষান্তরাল হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া আর গৃহে ফিরিলাম না, আহত হৃদয়ে মাঠের দিকে অশ্ব চালিত করিলাম।

সে দিন বসন্ত কালের পূর্ণিমা। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে অনন্ত আকাশ ও সুবিস্তীর্ণ ধরাতল প্লাবিত হইতেছিল, এবং পৃথিবীর অসংখ্য মানবহৃদয় তখন কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের অবসর সুখ অনুভব করিতেছিল; চারিদিকে কত কাব্য, কত গাথা, কত সঙ্গীত, শুধু আমারই চক্ষে তখন সমস্ত জগৎ অন্ধকার

ময় এবং পৃথিবীর হর্ষপূর্ণ হাস্যকল্লোল কঠোর বিপদ্ধ ধ্বনি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি জগতের বন্ধন মুক্ত পথিকের মত, আলোকহীন, বায়ুহীন, মহাশূন্য পথে অগ্নিগর্ভ লক্ষ্যভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় সবেগে ছুটিতে লাগিলাম, আমি নদীর ধার দিয়া, মাঠের উপর দিয়া, অরণ্যের প্রান্ত দিয়া, স্তব্ধ প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া, নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম; আমার অশ্বের সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া গেল, তাহার মুখে ফেণোদ্গত হইল, আমার অন্তরেন্দ্রিয় কণ্ঠাগত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাতে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই; যেন সুখহীন, আশাহীন, শান্তিহীন আমি চির জীবন ধরিয়া জ্বালাময় হৃদয়ে এমনি করিয়া মহাবেগে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অন্ধ আবেগে অনন্তের পথে ছুটিয়া চলিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"রাত্রি শেষে গৃহে ফিরিলাম, বাড়ীতে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মনের আবেগ একটু সংযত হইলে বুঝিলাম হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া ভুল করিয়াছি,— আমার প্রতিহিংসা লওয়া হয় নাই, যেমন করিয়াই হোক আজ প্রতিহিংসা লইতে হইবে; হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুণ জ্বালিয়া ক্লান্ত দেহে কম্পিত পদে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সকলেই সুষুপ্ত। দেখিলাম দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র, সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আমার স্ত্রী— পাপিষ্ঠা কলঙ্কিনী পুষ্প নিদ্রা যাইতেছে, তাহার মস্তক প্রান্তে কোরোসিনের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, সেই আলোকে পাপিষ্ঠার সুন্দর মুখ প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে, কিন্তু তখন আমার মোহ বিদূরীত হইয়াছিল, তাই ইচ্ছা হইতে লাগিল ঐ প্রাচীর হইতে একখানি ভুজালিয়া টানিয়া লইয়া, কিম্বা রিভল্‌বারে একটা টোটা পুরিয়া এখনি পাপীয়সীর প্রাণনাশ করি; কিন্তু পরক্ষণেই আমার জীবনের আনন্দ স্বরূপিণী আমার হৃদয়বল্লরীর অম্লান কুসুমকোরক পরিমলের দিকে দৃষ্টি পড়িল; নিদ্রিতা সর্পিণীকে আমি অস্ত্রাঘাত করিতে পারিলাম না, উন্মত্তের ন্যায় সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম।

সেদিন রাত্রে এই কক্ষে আজিকার মতই ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, টেবিলের চারি পাশে খানকত চেয়ার পড়িয়াছিল, আমি তাহার একখানার উপর উপবেশন করিলাম; ডাক্তার, আমি মাতাল নহি, কিন্তু আজ হৃদয় জ্বালা প্রসমিত করিবার জন্য আমি অতি তীব্র সুরা পান করিতে আরম্ভ করিলাম। সুরাপনে উন্মত্ত হইলে আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আরও প্রবল হইয়া উঠিল; ভাবিলাম, অস্ত্রাঘাত নহে, পাপিষ্ঠার প্রাণনাশ করিয়া কি করিব? তিল তিল করিয়া যাহাতে তাহার মৃত্যু হয় তাহাই করিব, তাহার শ্রেষ্ঠ সুখ বিনষ্ট করিব যেন পাপিয়সী তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার পাপের ফল ভোগ করে।

একবার আমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম, কোন কারণে একজন সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পাঁচটি দ্রাবক দান করে, এই পঞ্চ দ্রাবকের গুণ বড় বিস্ময়কর,— ইহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োগে মনুষ্যের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিনষ্ট করিতে পারা যাইত।

আমি আমার বাক্স খুলিলাম, শিশি পাঁচটা বাক্সের মধ্যেই ছিল। ল্যাম্পের আলোকে অকম্পিত হস্তে একটা শিশি বাহির করিয়া লইলাম, পৈশাচিক আনন্দে এবং প্রতিহিংসার উদ্দীপনায় আমার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল, সেই

শিশি লইয়া আমি দ্বিতীয় বার আমার পত্নীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পুষ্প তখনো তেমনি নিদ্রা যাইতেছিল, গভীর নিদ্রা ; আলুলায়িত কুন্তলে বিশৃঙ্খল বেশবাসে তাহাকে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া আমার মনে তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল, আমি যে তাহার নিষ্ঠুর কৃতান্তের মত অতি ধীরে, নিঃশব্দে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, সে কি তাহা জানিতে পারিতেছে ? দ্বিধাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার শয্যা প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলাম ; মুহূর্ত্তের জন্য তাহার ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠ মৃদু হাস্যে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে কি জাগ্রত হইয়া আমার এই দুঃসাহসের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতেছে ?— না, স্বপ্নে বুঝি নব প্রণয়ীর সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ পাপিষ্ঠাকে দণ্ড দিতেই হইবে ; দয়া করিব !— সে কি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও দয়া প্রকাশ করিয়াছে ? আমি এই স্তব্ধরাত্রে তাহার সুপ্তিঘোরে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাহাকে মারিতে আসিয়াছি, কিন্তু আমার ন্যস্ত অগাধ বিশ্বাস সে চূর্ণ করিয়া ফেলে নাই ? আমার কি অভাব ছিল, তাহাকে আমার কি অদেয় ছিল ? আমার বিপুল সম্পদ, আমার জীবন, যৌবন, সুখ, শান্তি, আপনার বলিতে পৃথিবীতে আমার যাহা কিছু আছে, আমার সর্ব্বস্ব তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু প্রতিদানে কি পাইয়াছি ?—

কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার!— আমি কম্পিত হস্তে দ্রাবকের শিশি আলোকের সম্মুখে ধরিলাম, দেখিলাম ইন্দ্রিয় শক্তিনাশী তরল গরল তাহার মধ্যে টলটল করিতেছে তখন—তখন আমি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করিয়া তাহার নিদ্রাচ্ছন্ন মুদ্রিত উভয় চক্ষুপ্রান্তে বিন্দু পরিমাণে সেই অমোঘ দ্রাবক ঢালিয়া দিলাম।"

আমার সঙ্গী সবেগে তাহার সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিল, তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু প্রসারণ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় একবার চারিদিকে চাহিয়া উভয় হস্তে চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদন করিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিলাম; ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল।

একটু সুস্থ হইয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "ডাক্তার, আমি আমার স্ত্রীর উভয় চক্ষে সেই দৃষ্টিশক্তি বিনাশক দ্রাবক ঢালিয়া দিলাম। যে চক্ষু তাহার দেহ ও মন কলুষিত করিয়াছে, তাহার যে চক্ষু আমার পবিত্র বংশ গভীর কলঙ্কে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাকে চিরজীবনের জন্য হতভাগ্য ও সুখশান্তিহীন করিয়াছে, তাহার সেই চক্ষু বিনষ্ট করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম; এই ঔষধ প্রয়োগে কিরূপ ফল হয় তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার পত্নীর শয়ন কক্ষ হইতে একটি মর্ম্মভেদী, অতি করুণ, অতি বিষাদাপ্লুত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম,

বুঝিলাম, ঔষধের ফল ধরিয়াছে, পুষ্প অন্ধ হইয়াছে।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে ‘ফ্লোরের’ উপর পড়িয়া গেল; আমি তাহাকে উঠাইব কি, আমার সর্ব্ব শরীর অসাড় হইয়া গিয়াছিল, আমার নড়িবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না।

কিন্তু তাহাকে উঠাইতে হইল না, কিয়ৎক্ষণ পরে সে নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, “ডাক্তার, সেই দিন হইতে পুষ্প অন্ধ—অন্ধ—অন্ধ। সেই যে এক দিন রাত্রে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহার পর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আর সে কিছুই দেখিতে পাইল না, সমস্ত জগৎ তাহার নিকট অন্ধকার, জীবন তাহার নিকট দুর্ব্বহ। এই সুন্দর, নানা বর্ণে চিত্রিত, বিবিধ বৈচিত্র্যশালিনী, অনন্ত রূপের আধার, অসংখ্য জীবধাত্রী সসাগরা ধরিত্রী, অগণ্য গ্রহতারাখচিত, দিগন্ত বিস্তৃত অসীম নীলাম্বর, হৃদয়ের অদ্বিতীয় অবলম্বন, জীবনস্বরূপিণী প্রিয়তমা কন্যার কমনীয় মুখকান্তি, জগতের সকল দ্রব্যের উপর তাহার চক্ষুর সম্মুখে সেই যে এক দিন আমি একখানি অন্ধকারের যবনিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছি, ইহজীবনে তাহা অপসৃত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই।

পুষ্প ভূমিতলে লুটাইয়া সামান্য রমণীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল, আমি দ্রাবকের শিশিটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম, ব্যাকুল ভাবে কোথায়

কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম জানি না। সমস্ত দিন আমি অনাবৃত মস্তকে বিদীর্ণহৃদয়ে রৌদ্রের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলাম, আমি উন্মত্ত হইয়া পড়িলাম।

তাহার পর কত দিন কাটিয়া গিয়াছে, আমি যেন পূর্ব্বেকার সে লোক নহি, সময়ে সময়ে আমি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, সেই দিন হইতে আমি নিশি দিন অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছি আমি সমস্ত দিন ধরিয়া আলোকহীন রুদ্ধ গৃহে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া থাকি, রাত্রিকালে জল, ঝড়, অন্ধকারময় দুর্য্যোগের মধ্যেও শান্তিহীন, নিদ্রাহীন, নিরাশা তাড়িত প্রেতের মত পথে পথে ছুটিয়া বেড়াই, আমার ন্যায় হতভাগ্য পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নাই।

ডাক্তার, প্রতিহিংসা গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই আমার এত কষ্ট হইত না, কিন্তু আমি মহাভ্রমে পড়িয়াছিলাম, ঈর্ষা-কুল বেগবান হৃদয়কে কখন বিশ্বাস করিতে নাই, ঈর্ষাবশেই আমি এই মহাপাপ করিয়াছি ; অনুসন্ধান করিয়া পরে জানিতে পারিয়াছি পুষ্প অপরাধিনী নহে, এই সনাতন দাস লোকটা অন্য কেহ নয়, পুষ্পের সহোদর ভ্রাতা লাহোরের সেই খাতাঞ্চী, সেখানে সে এক গুরুতর জালের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলায় পলাইয়া আসে এবং অতি সংগো-পনে তাহার ভগিনীর আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু পুষ্প তাহার পিতৃবংশের এই অপযশের কথা কোন দিন আমার নিকট ব্যক্ত না করিয়া ভ্রাতার উদ্ধারের জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে

ছিল। সনাতন শেষ দিন পুষ্পের হাতে যে সকল কাগজপত্র দিয়াছিল তাহা তাহারই নির্দ্দোষিতার প্রমাণ, সেই সকল কাগজপত্র দিয়া সে পুষ্পকে অনুরোধ করিয়াছিল যেন অন্ততঃ তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ লইয়াও আমি তাহার সাহায্যের জন্য চেষ্টা করি, সেই রাত্রেই হয়ত পুষ্প আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিত, কিন্তু আমি অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া সহসা কি ভীষণ অনর্থপাত করিয়া বসিলাম !

তাহার পর মনকে প্রবোধ দিবার জন্য, কত চেষ্টা করিয়াছি, অসার তর্ক এবং মিথ্যা যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শান্তি লাভের আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই ; আমি যেখানে যাই সেখানেই রমণীর করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস আমার কর্ণে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে অস্থির করিয়া তোলে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গমন করিলেও বোধহয় আমার নিরাশ্রয় অন্ধ পত্নীর ছায়া, আমার ক্ষুদ্র অনাথা কন্যার ছায়া মূর্ত্তিমতী অনুতাপের মত আমার অনুসরণ করিবে, এ যন্ত্রণা আমার সহ্য হয় না, আমি কোথায় যাইব, আমি কি করিব, ডাক্তার, উপায় বলিয়া দাও।

এই অসামান্য হৃদয়জ্বালার উপর আর এক যন্ত্রণা হইয়াছে, আমি অনুভব করি কে যেন আমার উভয় চক্ষে প্রতি মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে, ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারি না ; আমি কলিকাতার প্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের চিকিৎসকগণের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়াছি,

কিন্তু তাঁহারা কেহই চক্ষুর কোন দোষ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কোন কোন চিকিৎসক আমাকে কিছু দিন অন্ধকারময় গৃহে বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও আমি কোন ফল পাই নাই ; পরমেশ্বর বোধহয় আমাকে এইরূপে আমার অপরাধের প্রতিফল প্রদান করিতেছেন।

অনুতাপই আমার উপযুক্ত দণ্ড মনে করিয়া আমি সকল যন্ত্রণা সহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু অনুতাপ নিস্ফল, এ যন্ত্রণা অসহ্য ; আমার আর কোন আশা নাই, ধৈর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে; আমার চারিদিকে শুধু ভীষণ অন্ধকার, নিরাশা, ক্ষোভ এবং অশান্তির অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে অনুতাপের অতি তীব্র, দীপ্যমান, জ্বালাময় শিখা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিরন্তর আমার হৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করিতেছে।"

বক্তা নীরব হইল। আমি কি বলিব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সে এমন ভাবে তাহার সেই লোমাঞ্চকর কাহিনী বলিয়া গেল যেন গল্পস্রোতে আমি ভাসিয়া গেলাম, আমার বোধ হইল আমি এই প্রলয়ঙ্করী প্রাবৃষিক নিশীথে এক বিচিত্র, লোমহর্ষণ, ভয়ানক অভিনয়ের দর্শক আর সে স্বয়ং অভিনেতা। আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে উত্তর করিলাম, "আপনার কথা সত্য হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি ইহা কাল্পনিক যন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

বক্তা আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল, "না, কখন না, কাল্পনিক যন্ত্রণা কখন এরূপ ভয়ানক হইতে পারে না।"

আমি দ্বিতীয় কথা না বলিয়া উঠিলাম, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলাম, "এক দিন দিনের বেলা আপনি নন্দনগাছি আমার হস্‌পিটালে যাইবেন, আপনার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

তখন সে আমার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "অনেক ভাল ডাক্তারকে দিয়া চক্ষু পরীক্ষা করাইয়াছি, পুনর্ব্বার পরীক্ষা অনাবশ্যক, কিন্তু আমার যন্ত্রণা নিবারণ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, এখন তাহাই অবলম্বনীয়।"— তাহার চক্ষু উজ্জ্বল ও বৃহৎ হইয়া উঠিল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি উপায় ?"

"ডাক্তার, আমার চক্ষু নষ্ট করিয়া দেও ; এমন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া অনেক ভাল, তাহা হইলে আমি পুষ্পের মত অন্ধ হইব।"

তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া আমি ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম।

তখন সে ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে আমার সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, বজ্রকঠোর

স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না?"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু জ্বলিতেছে, ভ্রু কুঞ্চিত, এবং ওষ্ঠে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত; আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "নিশ্চয়ই নহে।"

উন্মত্তের ন্যায় সে বলিল, "আমি যাহা বলিতেছি তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, নতুবা নিস্তার নাই।"

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য জানি, এখন পথ ছাড়।"

তাহার পর— তাহার পর কি হইল সে কথা বলিতে এখনো ধমনীতে রক্তস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হয়, সে কথা ভাবিতেও সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। দুরাত্মা অতর্কিত ভাবে দুই হস্তে আমাকে ভূতলশায়ী করিয়া আমার বক্ষে জানু দিয়া চাপিয়া বসিল, এবং সজোরে আমার কণ্ঠনালী রোধ করিল; আমি অতি কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে সক্ষম হইলাম।

"এখনো সম্মত হও।"

"প্রাণ গেলেও নহে",— রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি এই উত্তর দিলাম। উভয় হস্তে আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সে ক্রমেই অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিল; আমি মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক নিশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, দৃষ্টিহীন

বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখে দীপরশ্মি নিষ্প্রভ হইয়া গেল, এবং ঘনঘোর বর্ষার সেই ঝটিকাসংক্ষুব্ধ বৃষ্টি-প্লাবিত রজনীর অবসান কালে, আমার সমস্ত দেহতন্ত্রী ভেদ করিয়া আমার কণ্ঠাগত প্রাণের অভ্যন্তর হইতে, অতি ভয়ঙ্কর, তমোময়ী মৃত্যুযামিনীর অশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনির মত একটা অবিরাম শব্দকল্লোল আমার শ্রবণ বিবরে ধ্বনিত হইতে লাগিল, বুঝিলাম, আমার অন্তিম কাল সন্নিকটবর্ত্তী।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিলুপ্তপ্র[illegible] [illegible] সময় অদূরে কাহার চঞ্চল পদধ্বনি হইল, অবিলম্বে একটি বালিকার অতি মধুর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে দ্রুত পদে আমার আততায়ীর উপর আসিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার কণ্ঠের বন্ধনও শিথিল হইয়া আসিল, কিন্তু মুক্তি লাভের পূর্ব্বেই আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় জাগিয়া দেখি আমি নন্দনগাছিতে আমার গৃহকক্ষে শয়ন করিয়া আছি, সর্ব্বশরীরে বেদনা, কিরূপে এখানে আসিলাম জিজ্ঞাসা করায় আমার ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, রোগী দেখিতে গিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে দারু পান করিয়া নাকি আমি অচৈতন্য হইয়াছিলাম, তাই নিরুপায় হইয়া তাহারা আমাকে পাল্কীতে তুলিয়া গৃহে রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কে এ কথা অবিশ্বাস করিবে? প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা আমি কোন দিন কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই।

এক মাস পরে এক দিন সকালে সাহসে ভর করিয়া আমি নসরতপুরের সেই ভয়ানক বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, সদর দরজা তালা দিয়া বন্ধ করা; একটা উড়ে মালী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, একুঠী 'জার্ডিন স্কীনার' কোম্পানীর,কুঠীর কাজ এখন বন্দ আছে, ম্যানেজার সাহেব এখানে নাই। আমার পূর্ব্ব বর্ণিত অপরিচিত সঙ্গী, তাহার অন্ধ পত্নী কিম্বা বালিকা কন্যার সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সেই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত শারদ প্রভাতে, বিহঙ্গকাকলী মুখরিত, অনিল-বিকম্পিত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হৃদয়ে আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার অর্থ কি, ইহা কি ইন্দ্রজাল? যদি ইন্দ্রজাল না হয় তবে ইহা—

"সত্য ঘটনা না ভৌতিক কাণ্ড?"

পতিতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপমঞ্জরী পল্লীগ্রামের গৃহস্থের মেয়ে; মা বাপে তাহার নাম রূপমঞ্জরী রাখিয়াছিল কেন বলা যায় না, কিন্তু সেই সুন্দরী বালিকার অস্ফুট রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেরই মনে হইত তাহার এ নামটা নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। যখন তাহার বয়স তিন বৎসর, সেই সময় তাহার মায়ের মৃত্যু হয়, সংসারে বৃদ্ধ পিতা ও দূরসম্পর্কীয়া পিসী ভিন্ন আর কেহ ছিল না, পিতা হরিহর বাচস্পতি স্বগ্রাম নারায়ণপুরে পৌরহিত্য করিতেন, তাহাতে যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত তদ্দারা এই ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণপোষণ কোন প্রকারে চলিয়া যাইত।

নারায়ণপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। এখানে পাদরীদের একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল; বয়স একটু বেশী হইলে রূপমঞ্জরী তাহার ছোট শ্লেটখানি, বালির কাগজে বাঁধা একখানা খাতা আর একখানি প্রথম ভাগ লইয়া পাড়ার অন্যান্য বালিকার সঙ্গে স্কুলে পড়িতে যাইত, এবং কোন দিন তাহার সখী কায়স্থদের মেয়ে মালতীর আগে স্কুলে যাইতে পারিলে অনেকখানি আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

গ্রীষ্মকালে বেলা দশটার সময় দেখা যাইত একটি ছোট মেয়ে, মুখখানি তার ঢল ঢল সুন্দর, নাকে একটি ক্ষুদ্র নলক এবং হাতে কয়েকগাছি কালো চুড়ী, খাতা ও বই সমেত শ্লেটখানি কখন মাথার উপর ধরিয়া, কখন এ হাতে ও হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতি চঞ্চল পদে বাড়ী ফিরিতেছে, ধুলি রাশির মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র পদচিহ্ন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিত। আবার কোন দিন বালিকা ঘোষেদের বকুল তলায় আসিয়া শ্যাম লতা ছিঁড়িয়া বকুলের মালা গাঁথিতে বসিত। তাহার বই গুলি মাটিতে পড়িয়া আছে, রৌদ্রোত্তাপে তাহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে এবং সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে; সে বসিয়া বসিয়া মালাই গাঁথিতেছে, তাহার অঞ্চল মাটিতে লুটাইতেছে, তাহার কেশের গুচ্ছে দুই একটি শাখাভ্রষ্ট প্রস্ফুটিত বকুল ফুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই বেশে তাহাকে বনদেবীর মত সুন্দরী দেখাইত, যে তাহাকে দেখিত সেই বলিত, 'হাঁ, বাচস্পতি ঠাকুরের মেয়ে সুন্দরী বটে!'—সুমার্জ্জিত দীপ্ত সৌন্দর্য্য নহে, কিন্তু তাহার কমনীয় মুখখানিতে এমন প্রফুল্ল মিষ্ট ভাব, এমন একটি সরল মাধুরী ছিল, যাহা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গোলাপ সুন্দর, বিলাসীর প্রমোদ উদ্যানের শ্রেষ্ঠতম রত্ন, কিন্তু ক্ষুদ্র যুথিকা এবং বনফুল যখন পল্লীবাসী দরিদ্রের পর্ণকুটীর প্রান্তে, পল্লবের স্নিগ্ধ অন্তরালে বিকশিত

হইয়া সুবিমল সুধাময় সৌরভ বিকীর্ণ করে, তখন সেই পর্ণকুটীরখানি দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র বোধ হয়। পল্লীগ্রাম প্রান্তবর্ত্তী হরিহরের ক্ষুদ্র কুটীর সেই দেবমন্দির, ক্ষুদ্র বালিকা রূপমঞ্জরী— সেই আরণ্য পুষ্পমঞ্জরী।

* * * *

ক্রমে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল ;— ক্ষুদ্র রূপমঞ্জরী আর তেমন চঞ্চলা বালিকা নাই, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; বৃদ্ধা পিসী অসমর্থা হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহাকেই অধিকাংশ সময় পিতার পূজার্চ্চনা হইতে তাঁহার গৃহ দেবতা ও তাঁহার সকল কাজ দেখিতে হয়। স্কুলে যাওয়া অনেক দিনই বন্দ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পাঠ বন্দ হয় নাই ; সকালে দীঘি হইতে স্নান করিয়া আসিয়া সে পিতার আহ্নিক পূজার আয়োজন করিয়া দিত, তাহার পর রন্ধনাদি সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া অপরাহ্নে যে কিছু অবসর পাইত, সে সময়টা সে পুস্তকাদি পাঠে ক্ষেপণ করিত।

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা যে রকমই হোক,বাচস্পতি ঠাকুরকে কন্যা লইয়া বড় বিপন্ন হইতে হইল। এত বড় মেয়ের বিবাহ না হওয়া কিছু বিস্ময়কর হইলেও উপায় ছিল না, কারণ বাচস্পতি মহাশয় কিছুতেই সমযোগ্য বর মিলাইতে পারিলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে ত্রিবে-ণীতে একটি পাত্রের সন্ধান হইল, বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ। যে

বয়সে সে কালের বৃদ্ধেরা সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতেন, সেই বয়সে ত্রিবেণীর এই বৃদ্ধ বরটি চুলে কলপ এবং গোঁফে আতর দিয়া, ফিণফিণে ফিতে পেড়ে কাপড় পরিয়া, আবার নূতন করিয়া তৃতীয় পক্ষে সংসার রঙ্গভূমে ফুলের মালা ও সুসজ্জিত দীপাবলীর মধ্যে প্রেমাভিনয়ের আয়োজন করিলেন।

যাহা হউক, কন্দর্পদেব তখন সজাগ ছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু কৃতান্তদেব বিবাহের পূর্ব্বেই এই বৃদ্ধ বরটির প্রতি যে অব্যর্থ শরসন্ধান করিয়াছিলেন তাহার অমোঘ আঘাতে তিনি বিবাহের অতি অল্প দিন পরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন ; বিবাহের প্রায় ছয় মাস পরে এক দিন প্রাতঃকালে নারায়ণপুরে সংবাদ আসিল, রূপমঞ্জরী বিধবা হইয়াছে। বাচস্পতি মহাশয়ের নবজামাতা মহেশ্বরের ক্ষয়কাশ রোগে ত্রিবেণীতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইয়াছিল।

এই সংবাদ শুনিয়া বাচস্পতির দীপ্তিহীন কোটরগত চক্ষু জলে পূরিয়া উঠিল, একবার তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন,'মা ব্রহ্মময়ি, এ কি করিলে?'— কিন্তু তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অনেক শোক তাপ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, সংসার অসার এবং সকলই মায়াময়, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল না; সুতরাং তিনি মন স্থির করিলেন, বুঝিলেন, জন্ম হইলেই মৃত্যু বিধাতার

নিয়ম, শোক করা অনর্থক ; তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য, তাঁহার কন্যা ব্রহ্মচর্য্য করিয়াই জীবনপাত করিতে পারিবে, ইহাই আর্য্য রমণীর সনাতন ধর্ম্ম। কিন্তু রূপমঞ্জরীর বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর, যৌবনবসন্ত তাহার দেহে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহার লজ্জাভারাবনত চঞ্চল দৃষ্টি, তাহার সুমিষ্ট হাস্য, তাহার যৌবনপুষ্পিত দেহলতার অপূর্ব্ব লাবণ্য সুরলোকের বিকশিত পারিজাতের মত শোভা বিকাশ করিয়াছে ; কিন্তু এত রূপ, এমন নব যৌবন, এরূপ দুর্লভ কমনীয় কান্তি লইয়াও রূপমঞ্জরীকে বিধবা হইতে হইল। কেহ তাহার চক্ষে এক বিন্দুও জল দেখিতে পাইল না ; এক দিন সকালবেলা সে হাতের নোয়া খুলিয়া, সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া, গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী দীঘি হইতে স্নান করিয়া আসিল ; তরুণ সূর্য্য তখন কেবল মাত্র পূর্ব্ব গগন আলোকিত করিয়াছে, পাখীরা গান গাহিতেছে, ফুলগুলি তখনো শিশিরসিক্ত হইয়া তরুশাখায় ফুটিয়া আছে, এবং আলোকোজ্জ্বল আমাদের এই প্রাচীন বসুন্ধরা কত উৎসাহ, কত সঙ্গীত, কত আশা বক্ষে ধরিয়া সৃষ্টির প্রথম দিনের ন্যায় মানবের চক্ষে নবীন ভাবে প্রতিভাত হইতেছে, শুধু একটি বালিকা এই হর্ষমগ্ন প্রভাতে জীবনের সকল কার্য্য ছাড়িয়া, সুখ ও আনন্দের সকল আশা দীর্ঘিকার গভীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিল। পিসীমা বৈধব্যযন্ত্রণা জানিতেন, এই শোচনীয়

সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই তিনি কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে ছিলেন, জামতার অভাব হইল ভাবিয়া নহে, কন্যার কষ্ট মনে করিয়া ; দুধের মেয়ে মঞ্জরী কেমন করিয়া একাদশী করিবে, মাছ ভিন্ন একবেলা যাহার মুখে ভাত রোচেনা, সে এই দীর্ঘজীবন কেমন করিয়া একসন্ধ্যা হবিষ্য করিবে, এই চিন্তাতেই তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শুভ্রবসনা বিধবাবেশিনী মঞ্জরীকে স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভাইরে ভাই, তখনই ত বলেছিলাম ও রকম তিন কেলে বুড়োর হাতে আমার সোনার বাছাকে সঁপে দিয়োনা ; হায়, হায়, আজ বৌ বেঁচে থাক্‌লে কি আর সে এমন ক'রে বাছার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে দিতো ?— কুল কুল ক'রেই তুমি সর্ব্বস্ব ঘুচো'লে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে আরো দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। ষোড়শী যুবতী রূপমঞ্জরীর সর্ব্বাঙ্গে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু হায়, তাহার জীবন শূন্য ; তাহার বিষাদ-কালিমা-সমাচ্ছন্ন মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় রমণী অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে। সে তাহার নিভৃত হৃদয় কাহারো কাছে প্রকাশ করে না, হবিষ্য করে, বৃদ্ধ পিতার সেবা করে, নারায়ণের ভোগ রাঁধে, সন্ধ্যাকালে দাওয়ায় বসিয়া চুপ্ করিয়া কত কি ভাবে।

কিন্তু ভাবিয়া সে কিছুই ঠিক করিতে পারিত না, সন্ধ্যাকালে যখন পৃথিবীর জনকোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিত এবং তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লীখানি সন্ধ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইত, তখন সে সেই তিমিরাবৃত আকাশের দিকে, খদ্যোতস্ফুরিত অদূরবর্ত্তী সমুচ্চ অশ্বত্থবৃক্ষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যে সকল কথা ভাবিত, তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকিত না, সমস্ত বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া তাহার মনে হইত। পরমেশ্বরের অনেক সৃষ্টির অনাবশ্যকতা সে হৃদয়ঙ্গম করিত—তন্মধ্যে তাহার জীবন একটা।

যদি তাহার ছোট ভাই কি ভগিনী থাকিত, সংসারে যদি বেশী কাজ থাকিত, তাহা হইলে হয় ত তাহার হৃদয় নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়া যাইত,

সে নিজের অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর পাইত না; কিন্তু বৃদ্ধ পিতা, বিধবা পিসী, এক বর্ত্তুল শালগ্রাম শিলা, এবং একটা গাই গরু ছাড়া সংসারে আর কেহ ছিল না। পিসীমা কোন কোন দিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে রামায়ণখানি পড়িতে বলিলে সে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া পিসীমাকে রামায়ণ শুনাইত। জনমদুঃখিনী অভাগিনী সীতার বনবাসের কথা পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত, রাজেন্দ্রাণী হইয়াও লঙ্কায় রাক্ষসের হস্তে তাঁহার কত লাঞ্ছনা, সীতার দুঃখ কষ্ট সে হৃদয় দিয়া অনুভব করিত, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কত কথা ভাবিতে ভাবিতে অভাগিনী ঘুমাইয়া পড়িত।

খৃষ্টান মিসনরীদের স্কুলে পড়িয়া গুরুমাদিগের হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী উপদেশে বাল্যকাল হইতেই হিন্দুদেবদেবীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি বিলুপ্ত ও বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, অথচ লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, এবং প্রতিদিনের অভ্যস্ত দেবসেবার মধ্যে থাকিয়া তাহার হৃদয়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে পায় নাই, সুতরাং তাহার হৃদয়ের এক অংশ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিধবা না হইলে হয় ত সে তাহার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ স্বামীকেই জীবন মরণের অদ্বিতীয় অবলম্বন ভাবিয়া সুখী হইতে পারিত, ও ইহাই বিধিলিপি ভাবিয়া সুখেদুঃখে নীরবে তাহার জীবনের দিনগুলি ক্ষেপণ করিত; কিন্তু সামান্য সাংসারিক কাজ ব্যতীত তাহার হৃদয়ের কোনই অবলম্বন ছিল না, সুতরাং সে আপনার ক্ষুধিত

তৃষিত তাপিত চিত্ত'কে যতই শান্ত করিবার চেষ্টা করুক, তাহার লক্ষ্যহীন শূন্য হৃদয় বেদনাভরে মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত।

এই সময়ে তাহার জীবনের আর এক পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহার বাল্যসহচরী মালতী কায়স্থদের মেয়ে। বরাহনগরে, এক বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র জমীদারপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। অনেক দিন পরে মালতী বাপের বাড়ী আসিয়াছে, সে রূপমঞ্জরীর সমবয়স্কা; স্বামীপ্রেমে পূর্ণ-হৃদয়া, সৌভাগ্যবতী সালঙ্কারা চারুহাসিনী সুন্দরী মালতীর সঙ্গে তিন বৎসর পরে যে দিন নিরলঙ্কারা, শুভ্রবসনা বিধবা রূপমঞ্জরীর সাক্ষাৎ হইল, সেদিন রূপমঞ্জরী তাহাতে ও মালতীতে কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিল! মালতী তাহার বাল্যসহচরীর দুর্ভাগ্য দেখিয়া নিজের সুখ ও সৌভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, এই আন্তরিক সুগভীর সহানুভুতিতে রূপমঞ্জরীর দুটি চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে শোকাবেগ প্রশমিত হইলে মালতী তাহার গভীর প্রেমপূর্ণ চক্ষুদ্বয় রূপমঞ্জরীর অশ্রুসিক্ত কাতর মুখের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রূপী, কেমন ক'রে তোর দিন কাট্‌চে ভাই,"— রূপমঞ্জরী একটু হাসিল, নিরাশা বিজড়িত সেই মৃদুহাস্য মেঘমণ্ডিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় ম্লান এবং স্নিগ্ধ, হাসিয়া উত্তর করিল, "দিন কি প'ড়ে থাকে? কিন্তু বড় কষ্ট

ভাই, এত কষ্ট যে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না, এমন পোড়া অদৃষ্ট নিয়েও জন্মেছিলাম!" মালতী বলিল, "দুঃখ ক'রে আর কি কর্‌বে বোন, মানুষের ত কোন হাত নেই, পরমেশ্বর যা করেন তাই হয়। কত দিন হ'তে মনে কচ্ছি তোমার এই দশা হয়েছে একবার দেখে আসি, মা বাপের মুখ কত দিন দেখিনি, বাপের বাড়ী আসবার জন্যে প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো, তা তিনি কি আস্‌তে দেন?—একদণ্ড আমাকে চোখের আড়াল কর্ত্তে চান না, আমার জন্যে যেন পাগল। পূর্ব্ব জন্মের কত তপস্যায় কত ভাগ্যে তাঁকে পেয়েছি, ছেড়ে এসে মনটা বড় খারাপ হয়েছে, শুধু সেই মুখখানিই মনে পড়চে; যাহোক ভাই, যে কদিন এখানে থাকি রোজ যেন দেখা হয়। আহা, তোমার এমন রূপ, যেন কালি প'ড়ে গিয়েছে, চুল ঝাড়টা রুখু, পরনে থানের গড়া, গোলগাল ননির মত নরম হাত দু'খানি খালি, একি চোখে দেখা যায়? ভাগ্যে তোর মা নেই ভাই।"—রূপমঞ্জরী নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ ফিরাইল, তাহার চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বুকের কাপড়ে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

আর বেলা নাই, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, বাচস্পতি ঠাকুরের বাড়ীর পাশে বাঁশ ঝাড়ে পাখীর দল সান্ধ্যকাকলী আরম্ভ করিয়াছে, এবং রূপমঞ্জরীর বৃদ্ধা পিসী ঘরের দাওয়ায় মাটির প্রদীপের জন্য "শল্‌তে" পাকাইতে বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে দত্তদের ছোট বৌ কলসীকক্ষে আসিয়া বলিল,

"রূপো ঠাকুরঝি, সাঁজ বাঁউড়ে যায় যে, জলকে যাবে না?"

রূপমঞ্জরী তখন দত্ত বধূর সঙ্গে জল আনিবার জন্য সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া ঘাটে চলিল। মালতী তাহার চারিগাছ ডায়মণ্ডকাটা মলের ধ্বনিতে সেই বিজন গ্রাম্যপথ ঝঙ্কারিত করিয়া "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার" মত নবপুষ্পিতা দেহলতা লইয়া ধীরমন্থর গমনে পৈত্রিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সিক্তবস্ত্রে কলসীকক্ষে জল আনিয়া সন্ধ্যার পর গৃহকোণে বসিয়া রূপমঞ্জরী তাহার বাল্যসখী মালতীর সুখের কথা ভাবিতে লাগিল। হায়, আজ তাহাতে ও মালতীতে কি প্রভেদ! মালতীর এই সুখের জন্য সে তাহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছে না, কিন্তু রূপযৌবনমণ্ডিতা, সুখ-সৌভাগ্যবতী মালতীর সহিত তুলনায় সে যে কতখানি দুর্ভাগিনী তাহাই মনে হওয়াতে তাহার বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফুটিয়া উঠিতেছে, সে ভাবিতেছে মালতী তাহার অপেক্ষা কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ?— মালতী অপেক্ষা সে রূপবতী, বংশগৌরবে উচ্চ, গুণেও বুঝি কম নহে, কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে এ আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন? বিধাতা একজনকে এত সুখী, সৌভাগ্যবতী, এমন স্বামীসোহাগিনী করিয়া আর একজনকে এরূপ দুঃখিনী স্বামীহীনা, হতভাগিনী করেন কেন? মালতী তাহার বাপের বাড়ী আসার পর তাহার রূপের প্রশংসা, তাহার গুণের প্রশংসা,

তাহার অলঙ্কারের প্রশংসায় তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, আর রূপমঞ্জরী মনের ভুলে কোন দিন একখানি পেড়েকাপড় পরিলে, চুলে ভাল করিয়া একটু তেল দিলে লোকের চক্ষুজ্বালা করে কেন? – "বিধবার আবার পেড়েলো কাপড় পরিবার সখ," "স্বামীহীনার আবার তেল মাথায় দিয়া চুল আঁচড়ানো," বলিয়া সকলেই অবজ্ঞাভরে তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লয়, কেহ বা ঈষৎ হাসিয়া বলে, "মরণ আর কি!"— সেই বিদ্রূপপূর্ণ হাসি বুঝি রূপমঞ্জরীর কোমল হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হয়। কিন্তু কেন যে সকলে তাহার প্রতি বিরূপ তাহা সে বুঝিতে পারে না, বিধবা হইয়াছে বলিয়াই কি তাহার অপরাধ? অপরাধ তাহার, না বিধাতার? তাহার হৃদয়ে কি প্রেম নাই, রূপমঞ্জরী যদি মনের মত রূপবান গুণবান স্বামী পাইত, তাহাহইলে সে দেখাইতে পারিত তাহার নিভৃত হৃদয়ে কি অগাধ প্রেম সঞ্চিত আছে, তাহা হইলে মালতীর স্বামীর মত তাহার স্বামীও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে চাহিত না। রূপ—রূপ—ছাই রূপ!— কুরূপা হইলে রূপমঞ্জরী এত কথা ভাবিত না, কিন্তু নিজে যে সে অসামান্যা রূপসী তাহা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিত না। তাই অনেক সময়ই তাহার মনে হইত, এমন ভুবনবিমোহন রূপ কি শুধু থানফাড়া শ্রীহীন মোটা বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য? এমন সুন্দর, সুগোল, সুকোমল ভুজবল্লরী

যাহা উচ্ছৃঙ্খল কঠোর বিশ্বকে মোহবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে তাহা কি চিরজীবন হবিষ্য রাঁধিতে ও গোরুর সেবা করিতেই নিযুক্ত থাকিবে? এমন সুদীর্ঘ, কমনীয়, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশপাশ—যাহার কোমল স্পর্শ পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপবান্ গুণবান্ পুরুষরত্ন আপনার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণের অতুলনীয় সুখ বলিয়া গণনা করিতে পারে, তাহা কি অযত্নে, রুক্ষভাবে এমনি করিয়া সন্যাসিনীর নিস্ফল জটায় পরিণত হইবার জন্য? চম্পকের ন্যায় কোমল, অকলঙ্ক চন্দ্রকলার ন্যায় প্রভাময় নখররাজীসুশোভিত অঙ্গুলীগুলি যদি ফুল-মালা গাঁথিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠে পরাইতে পারে, তবেই তাহা সার্থক, প্রাতিদিন গৃহে গোময় লেপন করিবার জন্যই কি বিধাতা সেই কোমল অঙ্গুলী এবং চারু করতলের সৃষ্টি করিয়াছেন? মালতীর মা কত দিন বলিয়াছেন, 'রূপ-মঞ্জরীর পা-দুখানিতে যেমন আলতা মানায়, মালতীর পায়েও এমন মানায় না, তাহার সেই শৈশবকালের অলক্তরাগ এখনও যেন তাহার পদপ্রান্তে তেমনি ফুটিয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে মাটীর পুতুল লইয়া যখন সে খেলা করিয়াছে তখন কতবার তাহার মনে হইয়াছে জীবনের এক শোভন অবসরে শিশুকন্দর্পের ন্যায় একটি সুন্দর, হাস্যময়, চঞ্চল শিশু তাহার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিবে, কিন্তু সে কি এক দিনও ভাবিয়াছিল তাহার সমস্ত বাসনা চূর্ণ হইয়া শূন্য কল্পনার মধ্যে এমনি করিয়া মিশাইয়া যাইবে? চিরদিন তাহাকে

এমনি দাসীপণা করিয়া এবং সকালে ও সন্ধ্যাকালে জলের কলসী টানিয়া তৃপ্ত থাকিতে হইবে? নিষ্ফল আশা, ক্ষুধিত প্রেম, ব্যর্থ মাতৃস্নেহের অজস্র প্রমত্ত কল্পনা রূপমঞ্জরীর হৃদয় ঝটিকাসংক্ষুব্ধ কুসুমকুঞ্জের ন্যায় আন্দোলিত করিতে লাগিল। এমন করিয়া কোন দিন সে নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে নাই, পোড়ারমুখী মালতী আসিয়াই ত সব গোল করিয়া দিয়াছে, কেন সে তাহার রূপের কথা নূতন করিয়া তাহার মনে জাগাইয়া দিল? তাহার অতৃপ্ত যৌবনতাপ তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইতেছিল, আজ অতি দুর্লক্ষ্য বর্ত্তিকা ধরিয়া কেমন করিয়া তাহার মনের মধ্যে বাসনার আগুন জ্বলিয়া উঠিল তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। পৃথিবীতে অতি অল্প কারণে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, এবং প্রথমে কেমন করিয়া অতি পবিত্র হৃদয়েও বাসনার বীজ উপ্ত হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না; বাসনা অপবিত্র হইলে তাহা হইতে ভ্রান্তি ঘটে, অবশেষে পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

রূপমঞ্জরী তাহার প্রবল বাসনাকে কিছুতে সংযত করিতে পারিল না। শ্রাবণের কুলপ্লাবিনী খরবাহিনী নদীপ্রবাহ কি বালুকা রাশি দ্বারা রুদ্ধ করা যায়? রূপমঞ্জরীর ব্রহ্মচর্য্য, তাহার প্রতি দিনের অভ্যস্ত গৃহকর্ম্ম তাহার প্রবৃত্তিস্রোত রোধ করিতে সক্ষম হইল না। রূপমঞ্জরী ভাবিত,

"আমি রূপসী কে এ কথা অস্বীকার করিবে? আমার রূপ আমার ভাল লাগে আমি নিজে তাহাকে উপেক্ষা করিব কেন? জানি একদিন আমি মরিব, কিন্তু মরিবার আগে একবার ভাল করিয়া সাজিয়া দেখিব আমি কত সুন্দরী। হায়, এই অতুল রূপ-ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী করিয়া কোন পাপে বিধাতা আমাকে ভিখারিণী সাজাইলেন?"— কুমতি তাহার কানে কানে বলিত, "বিধাতার ইচ্ছা নহে যে তুমি জীবনকে মরুভূমি করিয়া তোল, কেন তুমি সমাজের দাসত্ব করিতেছ? এই দাসত্বের বিনিময়ে পাইয়াছ কি? তুমি কি এই নির্য্যাতনের প্রতিফল লইতে পার না? কাহার পাপে এমন হইল?"

যাহার পাপেই হোক ধীরে ধীরে রূপমঞ্জরীর মনে মোহের সঞ্চার হইল; অবশেষে তাহার অন্তরাত্মা, তাহার জীবন, যৌবন, অপূর্ণ কামনা ক্রমে বিদ্রোহ ভাব ধারণ করিল। তাহার হৃদয় ও মন ঝঙ্কারিত করিয়া কে যেন সর্ব্বক্ষণ বলিতে লাগিল, "তুমি ভ্রান্ত, তাই নিজের ইচ্ছায় অনর্থক এত কষ্ট পাইতেছ।"

সুখবাসনা ক্রমে প্রবল হওয়ায় অবশেষে রূপমঞ্জরীর ভ্রান্তি ঘটিল।

—•—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাসে রূপমঞ্জরীর মামাতো ভগিনীর বিবাহ। বিবাহ উপলক্ষে সে সনাতনপুরে মামার বাড়ী গেল; সেখানে তাহার মাতুলপুত্র মাধবচন্দ্র ভিন্ন পুরুষ অভিভাবক আর কেহ ছিল না। মাধবচন্দ্র তাহাদের গ্রাম্য জমিদার নন্দকিশোর গাঙ্গুলীর সদর নায়েব।

বিবাহের পরদিন আত্মীয় স্বজন লইয়া মাধবের অন্তঃপুরে একটা ছোট রকমের ভোজ হইল, সেই উপলক্ষে মাধবের প্রভু নন্দকিশোরেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহারে বসিয়া নন্দকিশোর দেখিল, একটি সুন্দরী বিধবা যুবতী অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া দেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় পরিবেশন করিতেছে, মোটা থান তাহার মস্তক ও বক্ষঃস্থল বেষ্টন করিয়া কটি-দেশে জড়ানো, তাহার দুই এক গাছি চূর্ণকুন্তল বিশৃঙ্খল ভাবে স্বেদসিক্ত ললাটে আসিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি মাধুর্য্য-মণ্ডিত, চক্ষে প্রসন্ন তরল হাস্য,—জমিদার নন্দকিশোর কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল, সাগ্রহে অন্যের অলক্ষ্যে দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল; সহসা একবার চারি চক্ষুর মিলন হইতেই লজ্জায় রূপমঞ্জরীর সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, সসম্ভ্রমে বাম হস্তে অবগুণ্ঠন টানিয়া সঙ্কুচিত ভাবে সে দূরে পলাইল।

জমিদারনন্দন কিছু মুগ্ধ—একটু আহত হইয়াছিল।

আত্মসংযম কাহাকে বলে তাহা সে কখন জানিত না, যে বয়সে মানুষের বিচারক্ষমতা পরিণতি প্রাপ্ত হয়, ভাল মন্দ দেখিয়া শুনিয়া মানুষ নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লয়, নন্দকিশোরের এখনো সে বয়স হয় নাই. এখন সে পঞ্চ-বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক, তাহার উপর অল্প দিন মাত্র তাহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, তাহাকে সুপথে পরিচালিত করিবার কেহ নাই ; রূপমুগ্ধ, অব্যবস্থিতচিত্ত যুবক জমিদার অনতি-বিলম্বে রূপমঞ্জরীর সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইল।

আর রূপমঞ্জরী ?—সে মনের মধ্যে প্রেমের অতি সুন্দর, মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। সে বালবিধবা, পিপাসিত প্রেম তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে অতৃপ্তি ও বেদনা ভরা, বিলাসবিভ্রমপরিপূর্ণ সুখময় কল্পনার একটি সুশোভন সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিল। স্ত্রীর জীবনে যে একটা গৌরব-পূর্ণ, প্রেমমহিমাপ্রদীপ্ত, শ্রেষ্ঠ, সমুন্নত এবং অপ্রতিহত রাণী ভাব আছে তাহা সে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিত, অথচ সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ কতখানি নিবিড় এবং অপরি-হার্য্য তাহা ধারণা করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না, তাই আজ সে সহসা তাহার এই সতেরো বৎসর বয়সে, এই প্রভাময়, প্রেমালোকপরিস্ফুট যৌবনমধ্যাহ্নে তাহার শূন্য হৃদয়নিকুঞ্জে পুণ্যময় উপাস্য দেবতার সিংহাসনে একটি যুবকের বরণীয় মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিল, এই যুবক সনাতন-পুরের নবীন জমিদার নন্দকিশোর বাবু। চারি চক্ষুর ক্ষণিক

মিলনে এত বড় একটা কাণ্ড কেমন করিয়া ঘটিল তাহা বলা কঠিন, কিন্তু বিদ্যুৎভরা দুইখানি মেঘ যখন পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হয় তখন অশনিপাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।— কথা প্রসঙ্গে রূপমঞ্জরী এক দিন শুনিতে পাইল, নন্দকিশোর বিপত্নীক, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বক্ষের মধ্যে রক্তোচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হইয়া উঠিল।

মাতুলালয়ে আসিয়া রূপমঞ্জরী প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী গৌরী নদীতে জল আনিতে যাইত। কোন দিন সে একাকিনী যাইত, কোন দিন কোন পল্লীবধূ তাহার সঙ্গিনী হইত। এক দিন সে একাকিনী গিয়াছে, তখন অপরাহ্ণ অতীত প্রায়, সেই প্রদোষমুখে প্রথম আষাঢ়ের সজলকৃষ্ণ কাদম্বিনী পশ্চিম আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এবং পরপারস্থ বৃক্ষরাজীর ধূসর ছবি সেই গগনবিলম্বী বিস্তৃত মেঘস্তরে মিশিয়া গিয়াছিল। নব বর্ষাগমে জলরাশি চঞ্চল ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে এবং তাহা নদী তীরস্থ ধানের জমিতে প্রবেশ করিয়া ধান্যক্ষেত্রে একটা সজীব শ্যামলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রূপমঞ্জরী মাথার কাপড় ফেলিয়া আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া একদৃষ্টে সান্ধ্যশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, আর জলরাশি নাচিয়া নাচিয়া তাহার যৌবনমহিমাস্ফুট নবীনসুকোমল গণ্ডস্থল, তাহার কুন্তলগুচ্ছ, সোহাগভরে স্পর্শ করিয়া আহ্লাদে ঢলিয় পড়িতে লাগিল। এই সঙ্গীহীন সন্ধ্যায় বিশাল নদীবক্ষে

মুক্ত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যে যুবতী-বিধবার হৃদয়ে বিষাদঘন ভেদ করিয়া প্রীতির সুবিমল জ্যোৎস্নালোক বিকশিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় একখানি সুন্দর বোট আসিয়া সেই ঘাটে ভিড়িল, বোটের উপর হইতে কে একজন গাহিতেছিল:—

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিল না পদ, তরণীর অঙ্গে।
সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে ॥"*

রূপমঞ্জরী চাহিয়া দেখিল বোটের ছাদে বসিয়া গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া একজন এই গানটা গাহিতেছে, আর একজন অনিমিষ চক্ষে তাহাকে দেখিতেছে—রূপমঞ্জরী চিনিল, সে নন্দকিশোর। তখন সে সসঙ্কোচে জল হইতে উঠিয়া কলসীকক্ষে ত্রস্তপদে গৃহমুখে চলিল; দেখিয়া নন্দ-কিশোর তাহার সহচরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "কি রূপ ভাই! থানের কাপড়ে কি এমন রূপরাশি ঢাকিয়া রাখা শোভা পায়? আমার ইচ্ছা হয়, এমন যাহার রূপ তাহাকে বানারসী সাড়ী পরাইয়া, হীরার বালা, মতির মালা, সোণার হারে সাজাইয়া চক্ষের উপর দিবানিশি বসাইয়া রাখিয়া চক্ষু সফল করি।" রূপমঞ্জরী আপনার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, এবং নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল; আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল দৃষ্টিতে বোটের দিকে দ্বিতীয় বার চাহিয়া নত মস্তকে সে চলিয়া

গেল, কিন্তু তাহার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গের শোণিতরাশি দ্রুতবেগে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

রূপমঞ্জরী দৃষ্টির অতীত হইলে নন্দকিশোর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "চিনেছিস্ পুলিন, এ সেই, এই রত্নের জন্যই আমি পাগল হয়েছি, উপায় কি বল্ দেখি!"—পুলিনের গীতধ্বনির তখনো বিরাম নাই, মাথা নাড়িয়া সে গাহিতে লাগিল:—

"সাগর ছেঁচে রতন দিব,
কণ্ঠে রাখ্‌বে নিশি দিবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে এই গল্প পাঠ করিয়াছেন এইখানে আসিয়া হয় ত তাঁহাদের অনেকে সহসা বই বন্ধ করিবেন, এবং কেহ কেহ এই ক্ষুদ্র পুস্তক বহ্নিমুখে সমর্পণ করিবারও পরামর্শ দিবেন; আমার তাহাতে আপত্তি নাই, এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা রচনার উদ্দেশ্য যাঁহারা না বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তক পরিত্যাগ করাই সঙ্গত, কিন্তু যাঁহারা হতভাগিনী রূপমঞ্জরীর মত বালবিধবাকে যৌবনের আবর্ত্তে ভ্রান্তির দুর্দ্দমনীয় মোহে ঘুরিতে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাহার শোচনীয় পতনের শেষ দৃশ্য তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত না করিয়া আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর আখ্যায়িকার উপসংহার করিতে সক্ষম নহি।

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, মহাপাপে যাহাদিগের চরিত্র কলুষিত, সুরুচি রক্ষা করিয়া তাহাদের সকল কথা প্রকাশ করা অসম্ভব; সুতরাং রূপমঞ্জরী কিরূপে নন্দকিশোরের হস্তগত হইল সে পাপকাহিনী বিবৃত করিয়া কালি কলম এবং কাগজের অপব্যবহার করিবার আবশ্যক দেখি না, শুধু এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পল্লীগ্রামের একজন প্রতাপশালী জমিদারের পক্ষে একটি ধর্ম্মজ্ঞান বিরহিতা,

লুব্ধা, মুগ্ধা বিধবা যুবতীকে হস্তগত ও স্থানান্তরিত করা কিছুমাত্র কঠিন হয় নাই।

অতঃপর রূপমঞ্জরী সনাতনপুরেই নন্দকিশোরের বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিল। এত দিনে হত-ভাগিনীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, আজ দাসীগণ কেহ তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিতেছে, কেহ তাহার আগুল্‌ফ বিলম্বিত সুচিক্কন কৃষ্ণকুন্তলরাশি সুগন্ধি তৈলে নিষিক্ত করিতেছে, কেহ তাহার মনোরঞ্জনের জন্য বিবিধ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। নিঃস্ব ব্রাহ্মণের বিধবা দুহিতা প্রভূত ধনসম্পদের অধিশ্বরী হইয়া মনে করি-তেছে, এ সুখের বুঝি কোথাও তুলনা নাই, ইহা অগাধ, অপ্রমেয়, স্থির; সমুদ্রের ন্যায় অসীম, অনন্ত। তাহার এই বিপুল সুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা অনতিবিলম্বে ক্ষুদ্র সনাতনপুরের গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িল।

তখন গ্রামের ঘরে ঘরে মেয়েদের বৈঠক বসিয়া গেল। সেখানে যে যুবতীর সহিত রূপমঞ্জরীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণয় হইয়াছিল সে-ই সকল অপেক্ষা আগ্রহে তাহার অপযশ ও নিন্দা ঘোষণা করিতে লাগিল, যাহাদের চরিত্র তেমন পবিত্র নহে, তাহারাও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পথে ঘাটে বলাবলি করিতে লাগিল, "অমন রূপের মুখে আগুণ, কালামুখী গলায় দড়ি দিয়া মরুক।"—দাসী মুখে সকল কথাই রূপমঞ্জরীর কানে গেল, এবং শীঘ্রই সে নিজের

অবস্থা বুঝিতে পারিল। তাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এত ঐশ্বর্য্য, এমন সুখ, এই বিলাসিতার মধ্যেও এখন এক একবার সে আপনাকে নিতান্ত দীনহীনা, অনাথিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিল; তাহার বোধ হইল অন্য তরু হইতে পুষ্প চয়ন পূর্ব্বক তাহার শুষ্ক জীবন-শাখা সুশোভিত করিতে গিয়া সে ভারি ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।

কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই রূপমঞ্জরীর নিকট সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে, যে, নন্দকিশোর রূপবান্ বর্ব্বর যুবক-মাত্র; অবিনশ্বর অপার্থিব প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সে নন্দকিশোরের করে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহার অমূল্য রত্নের পরিবর্ত্তে যাহা লাভ করিয়াছে তাহা প্রেম-সুধা নহে, পাপ-পঙ্কিল রূপজমোহ-বিকার মাত্র। সে নন্দকিশোরের সুখ দুঃখের অংশভাগিনী বা তাহার বিপদসম্পদে অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারে নাই, কেবল কলঙ্কসজ্জিত বিলাস-শয্যার সঙ্গিনী হইয়াছে; তাই তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট দুর্ম্মতিগ্রস্ত জীবন নিতান্ত নিরর্থক মনে হইতে লাগিল।

রূপমঞ্জরী পশুপ্রকৃতি বিকৃতবুদ্ধি নন্দকিশোরকে দেবতা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নন্দকিশোর তাহাকে পশুত্বে অবনত করিবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না; কারণ নিঃস্বার্থ প্রেম কাহাকে বলে নন্দকিশোর তাহা জানিত না। রূপমঞ্জরীর মনে অবশ্যই সুখাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সে এক দিনও মনে করে

নাই, যে, আত্মাবমাননার বিনিময়ে তাহাকে এই সুখ ক্রয় করিতে হইবে ; তাই মোহাবসানে রূপমঞ্জরী দেখিল, এক প্রেমালোক-উদ্ভাসিত জীবন-মধ্যাহ্নে বিশ্বের মহিমাময় দেবতা ভাবিয়া সে যে জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল রবির আশ্রয় লইয়াছিল তাহা দেবতা নহে, মানুষও নহে, তাহা অতি উত্তপ্ত, কঠিন, জ্বালাময় অয়শ্চক্র মাত্র,— তাহার নারী-জীবনকে তাহা ধ্বংশ করিতে পারে বটে, কিন্তু অমৃত সিঞ্চনে সেই লুণ্ঠিতা, অবজ্ঞাতা, জীবন্মৃতা, প্রেমলতাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার তাহার সাধ্য নাই।

আম-জাম-নারিকেলবৃক্ষ পরিবৃত এই বৃক্ষবাটিকার নিকট দিয়া রূপমঞ্জরী কতদিন নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে ; সন্ধ্যাকালে যখন সে গা ধুইয়া তরুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন, বিহঙ্গমকলকণ্ঠকূজিত সংকীর্ণ বনপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত, তখন কতবার সে এখান হইতে ললিত মধুর 'হার-মোনিয়াম' সহযোগে গীতধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইতে শুনিয়াছে ; দৈবাৎ বর্ষার কোন মোহময়, মেঘময়, সিক্ত সন্ধ্যায় সেই বৃক্ষবাটিকার আলোকোজ্জ্বল দ্বিতল প্রকোষ্ঠ হইতে কলি-কাতাবাসিনী কোন পার্শ্বিন বিদ্যাধরীর মদিরা-বিহ্বল উত্তেজিতকণ্ঠনিঃসৃত বৃন্দাবনবিলাসিনী, শ্যামবিচ্ছেদকাতরা রাধিকার বিরহ-চঞ্চল হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তাহার কর্ণে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার হৃদয়ের স্থির, গভীর, আতটপূর্ণ প্রেমবারিধিবক্ষে লোষ্ট্রবিক্ষেপের ন্যায় তাহা

আলোড়িত, আন্দোলিত, কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে,— কত দিন তাহার মনে হইয়াছে ক্ষুদ্র নারীজীবনের এই অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের বহির্ভাগে, ঐ বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী অট্টালিকার অন্তর্দ্দেশে না জানি কোন্ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের বাস যাহাদিগকে জীবনের ক্রন্দন, সংসারের অভাব, রোগশোক এবং পরিতাপের যন্ত্রণা কিছুমাত্র সহ্য করিতে হয় না, শুধু সুখের স্মৃতি, প্রেমের গান, ফুলের গন্ধ আর শ্রুতিমধুর বাদ্যযন্ত্রের সুকোমল সুর লইয়াই তাহাদের নিশ্চিন্ত ' লঘুজীবন শরতের নির্গলিতাম্বুগর্ভ শুভ্র মেঘের ন্যায় অবাধে ভাসিয়া যাইতেছে।

কিন্তু এখানে আসিয়া এখন তাহার মনে হইতেছে, "কি করিলাম, কেন মজিলাম, কেন এখানে মরিতে আসিলাম? লোভে পড়িয়াই আমি বংশের গৌরব নষ্ট করিলাম, মোহে ভুলিয়াই নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিলাম, —পিতার নিষ্কলঙ্ক অম্লান জীবন আমিই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি; আমার অধঃপতনের কথা শুনিয়া কি তিনি আর বাঁচিয়া আছেন? বাঁচিয়া থাকিলেও কি তিনি লজ্জায়, মনস্তাপে জনসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছেন?"

সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না রাশিতে ছাদ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একটা বিরহী পাখী তখন নদীর অপর পারে দূর কাননের কোলে বসিয়া নিতান্ত একঘেয়ে সমুচ্চ করুণস্বরে আপনার একক জীবনের দুর্ব্বিসহ বেদনা প্রকাশ করিতেছিল,

এবং গ্রাম্য বৈরাগীর আখড়াতে হরিসংকীর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস-স্বরূপ মৃদঙ্গধ্বনি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু সে দিকে কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া আলোকোদ্ভাসিত চাতালে বসিয়া রূপমঞ্জরী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল ; এই সবে মাত্র তাহার ক্রন্দনের আরম্ভ, এ ক্রন্দনের বিরাম কোথায় তাহা সে জানে না। আজ তাহার মনে হইতেছে এই হীরক বিজড়িত অলঙ্কার, মুক্তার মালা এবং মূল্যবান রঙ্গীন পট্টবস্ত্র অপেক্ষা তাহার পিতৃগৃহের সেই সুপবিত্র,শুভ্র 'থানের গড়া' অনেক ভাল ছিল, সেখানে বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া কলসী কলসী জল বহিয়া দাসীবৃত্তির মধ্যে যে সঙ্কোচহীন স্বাধীনতা ছিল, এই অলঙ্কার-সমুজ্জ্বল বিলাস-বিড়ম্বিত কলঙ্কবন্ধন অপেক্ষা সহস্র গুণে তাহা বরণীয় ; সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সংযতহৃদয়া ব্রহ্মচারিণী বিধবার উপকরণহীন আতপান্ন, কলঙ্কিনীভোগ্য বিবিধ স্বাদুব্যঞ্জনপরিবৃত পলান্ন অপেক্ষা পবিত্র এবং তৃপ্তিকর। ক্ষুদ্র কুটীরে মৃৎপ্রদীপের সম্মুখে বসিয়া তাহার পিসীকে প্রতিরাত্রে সে যে রামায়ণের অমৃতগাথা পড়িয়া শুনাইত সেই পুণ্যকাহিনীর সহিত তুলনায় অদূরবর্ত্তী সুশোভিত কক্ষে ঐ ভূষণ-সিঞ্জিত বারাঙ্গনার কণ্ঠনিঃসৃত সুরলয়বদ্ধ সঙ্গীত কি তুচ্ছ! পূর্ব্বের চন্দ্র পশ্চিমে গেল, পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিল, রূপমঞ্জরীর চিন্তার অন্ত নাই।

কিন্তু একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, পদে পদে

তাহার ভ্রান্তি ঘটে; এই প্রকার অনুতাপ, বিলাপ, উৎকণ্ঠার মধ্যেও এত অজস্র স্তুতিবাদ, এরূপ অবিশ্রান্ত হাস্যামোদ, মধুর সঙ্গীত, উজ্জ্বল আলোকদাম এবং অগণ্য প্রস্ফুট পুষ্পের বিমল সৌরভ রূপমঞ্জরীকে এমন নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, যে, অবশেষে সে আপনাকে অগত্যা সুখী বলিয়াই মনে করিতে লাগিল ; রূপমঞ্জরী স্থির করিল, বিধাতা তাহার অদৃষ্টে ইহাই লিখিয়াছিলেন, অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না, তাহার অপরাধ কি ?— নিজে অপরাধ করিয়া অনেকে এইরূপ আত্মপ্রতারণা দ্বারা নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করে! প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, মানুষ প্রথমে পরমেশ্বরের উপর দোষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী, অপাপবিদ্ধ, অনন্ত পুরুষ যখন তাহার চক্ষু হইতে মোহান্ধকার অপসারিত করিয়া তাহার হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি জ্বালিয়া দেন, তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেও চারিদিকের প্রলোভনবন্ধন ছিন্ন করিয়া অনেক সময়ই সে আপনাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হয় না। রূপমঞ্জরীর পক্ষেও তাহাই ঘটিল, তাহার অনুতাপ-কষাহত ক্লান্ত বিদীর্ণহৃদয় মহাপাপের মধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়াও সেই গভীর পাপপঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রূপতৃষ্ণা চিরস্থায়ী নহে। দুই বৎসরের মধ্যেই নন্দকিশোরের মোহ বিদূরীত হইল,— রূপমঞ্জরীর প্রতি তাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ রহিল না; এমন কি, নন্দকিশোর তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে এই গলগ্রহটাকে বিদায় দিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু নন্দকিশোরের পক্ষে রূপমঞ্জরীকে গৃহবহিষ্কৃত করা সহজ হইল না। অগত্যা অনেক ষড়যন্ত্র করিয়া নন্দকিশোর তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে মনস্থ করিল; রূপমঞ্জরী সহসা কলিকাতা দর্শনের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না।

ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর সনাতনপুরের বাবুঘাট হইতে 'চম্পা' নামক বোট গৌরীবক্ষে আপনার সুসজ্জিত দেহখানি ভাসাইয়া দিল। সম্মুখে স্ফীতবক্ষ শ্বেতবর্ণ পা'ল, উপরে পত পত করিয়া লাল নিশান উড়িতেছে, প্রতি গবাক্ষদ্বারে প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পের মালা, পরিপূর্ণ নদী, তাহার উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে; শুভ্র বোটখানি সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নদীবক্ষে সন্তরণশীল মুক্তপক্ষ রাজহংসের ন্যায় সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

অবশেষে চাঁদের আলো যখন সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, উভয়তীরে ক্ষুদ্রপল্লী সমূহে জনকোলাহল মন্দীভূত

হইয়া আসিল, অরণ্যের অন্তরালে কৃষককুটীরের মৃৎপ্রদীপ নিবিয়া গেল, তখন মদিরোন্মত্ত নন্দকিশোর বোটের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, গবাক্ষপ্রান্তে একখানি ‘সোফায়’ বসিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বাঁশীতে গান আরম্ভ করিল।

সেই দ্বিপ্রহর নিশীথে বাঁশীতে সে যে গান গাহিতেছিল তাহা সুখের কিম্বা শান্তির গান নহে, জগতের বিরহ বিষাদ যেন সেই গীতে ক্ষরিত হইতেছিল, শ্রান্ত, ক্ষত, দুর্ব্বল হৃদয়ের হাহাকার তাহার প্রতিকম্পনে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, বোধ হইতেছিল যেন কোন অভিশপ্ত বিরহী জলদেবতা কত যুগযুগান্তর পরে আজ মধ্যরাত্রে গৌরীর তিমিরাবৃত গভীর গর্ভ হইতে আলোকোদ্ভাসিত বিস্তীর্ণ বক্ষে ভাসমান হইয়া তাহার দুর্ব্বহ নিরাশ্রয় বেদনাপ্লুত জীবনের শোক গাথা, সকরুণ মর্ম্মকাহিনী উদ্বেলিত হৃদয়ে বাঁশরীর উন্মাদক ভাষায় এই শান্ত, শব্দহীনা, আলোকাম্বরা ধরিত্রীর প্রতিরন্ধ্রে সম্প্রসারিত করিতেছে; সম্মুখে রজতশুভ্র চঞ্চল গৌরীর অনন্ত তরঙ্গরাশির মুক্তশোভা, ঊর্দ্ধে নক্ষত্রবিরল নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ প্রশান্ত হাস্য!—এমন স্থানে এমন সময়ে মানুষের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ঠিক এরূপ না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু যে কাহাকেও কখন ভালবাসে নাই, দীর্ঘ জীবনে যে এক জন লোককেও আপন করিতে পারে নাই, যে হতভাগ্য ব্যক্তি দিবারাত্রি চারিদিকে শুধু এক দল চাটুকারের মুখে আপনার অসার বাক্যের

উচ্চ প্রতিধ্বনি শুনিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে এবং স্বার্থপর সেবকের হীন তোষামোদে পরিবেষ্টিত থাকাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ভাবিয়া অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে, তাহারই মুগ্ধ হৃদয় একাকী এমন রাত্রে, এইরূপ সমুজ্জ্বল মহান্ দৃশ্যের মধ্যে সহসা জাগ্রত হইয়া সেই জটিল মোহবন্ধন ছেদনের জন্য দুঃখে ক্ষোভে এবং মনস্তাপে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।

নদীপথে সনাতনপুর হইতে কলিকাতা যাইতে অনেক দিন লাগে। কত গ্রাম, প্রান্তর, শস্যক্ষেত্র, শ্মশান অতিক্রম করিয়া বোট চলিতে লাগিল, বোটে দুই জন মাত্র যাত্রী, নন্দকিশোর এবং রূপমঞ্জরী; কিন্তু উভয়েই আত্ম-চিন্তায় বিভোর, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কেহ কাহা-কেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, দশ হাত স্থানের মধ্যে থাকিয়াও উভয়ের ভিতর অনন্ত ব্যবধান; রূপমঞ্জরী ভাবে আমার অপরাধ কি? পুরাতন হইলেই কি মানুষের মান যায়? পুরাতন বস্ত্র ত অতি সুকোমল, দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব সমধিক স্নিগ্ধ, মধুর; তবে প্রেম পুরাতন হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি এত উপেক্ষা কেন?

যাহা হউক আর সহ্য করিতে না পারিয়া রূপমঞ্জরী একদিন মুখ ফুটিয়া নন্দকিশোরের নিকট তাহার মনের ব্যথা ব্যক্ত করিল, বলিল, "আমার প্রতি তোমার এত বিরাগ, এরূপ নিদারুণ ঔদাসীন্য কেন? আমি তোমার কি করি-

য়াছি? না বুঝিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম এই ত আমার অপরাধ, কিন্তু তোমারই জন্য আমি এই কলঙ্কপসরা মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। যদি এমন ভাবে আমার এ প্রস্ফুটিত জীবন-কুসুমের দলগুলি এক একটি করিয়া ছিঁড়িয়া পদতলে বিদলিত করিবে, তাহা হইলে কেন আমাকে আমার পিতৃগৃহের স্নেহ, পবিত্রতা ও শান্তির ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া কলঙ্কে ডুবাইলে? সুখে দিন না যাক, দুঃখে কষ্টে ত কাল কাটিতেছিল, বুকের মধ্যে নিশিদিন এমন ভাবে রাবণের চিতা বহনকরা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"—শুনিয়া নন্দকিশোর মাথা নাড়িয়া সংক্ষেপে কহিল, "বড় ভুল করিয়াছিলাম, আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে।"

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র নন্দকিশোরের বন্ধুবর্গ আসিয়া জুটিল, এবং মধুচক্রের চতুর্দ্দিকে মধুমক্ষিকার ন্যায় গুঞ্জন আরম্ভ হইল। পূজার ছুটি হইয়াছে, সকলেরই সুদীর্ঘ অবসর, বাগানবাটীতে দিবারাত্রি আমোদ; গীত বাদ্য, নর্ত্তকীর নৃত্য, মদ্যের অজস্র প্রস্রবণ, অবিশ্রান্ত তোষামোদ বর্ষণ। নন্দকিশোর উন্মত্ত, তাহার বন্ধুবর্গ জ্ঞানশূন্য,—পরিপূর্ণ মাত্রায় যথেচ্ছাচারের বিরাম নাই।

মহাপূজার অবসানে বিজয়া দশমীর রাত্রে আমোদের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল; মদ্যোন্মত্ত নন্দকিশোর শয়নকক্ষে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া মুদ্রিত নেত্রে আলবোলা টানিতেছে, এবং একটি রূপসী বারবিলাসিনী তাহার শয্যাপ্রান্তে

বসিয়া গান আরম্ভ করিয়াছে। রূপমঞ্জরী নন্দকিশোরকে এখনও আপনার স্বামীর ন্যায় মনে করিত এবং পতির উপর পত্নীর অধিকারের কথা সে অনেক সময়ই বিস্মৃত হইত না। তাহার শয্যাপ্রান্তে কলঙ্কিনী বারনারী বসিয়া তাহা কলুষিত করিতেছে, এ দৃশ্য তাহার অসহ্য হইল, সে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এই সকল দেখাইবার জন্যই কি তুমি আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছ ?" নর্ত্তকী সুন্দরী তাহার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য কুটিল কটাক্ষপাত পূর্ব্বক নন্দকিশোরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকোপে সক্রভঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, ইনি কে ? আপনার স্ত্রী বুঝি ! তা যিনিই হোন, বাড়ীতে আনাইয়া আমার এত অপমান করান কেন ? আমি কি আপনা হইতে সাধিয়া আসিয়াছিলাম ?"—ক্রোধে সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল !

মদিরারুণনেত্র উন্মুক্ত করিয়া নন্দকিশোর দেখিল, সর্ব্বনাশ, বাইজি রাগ করিয়াছে ! উদ্বেগে নন্দকিশোরের নেশা ছুটিবার উপক্রম হইল, তাড়াতাড়ী উঠিয়া সে বাইজীর হাত চাপিয়া ধরিল, স্খলিত স্বরে বলিল, "রাগ করিওনা ভাই, ওটা নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, তোমার মর্য্যাদা কি জানিবে ? নতুবা আমার খরিদা বাঁদী হইয়া তোমার অপমান করিতে সাহস করে ?"

শুনিয়া রূপমঞ্জরীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, ঘৃণার সহিত

বলিল, "খরিদা বাঁদী বটে, কিন্তু বুঝিতে পারি নাই, বিনি-মূলে বিকাইয়াছিলাম, রত্নহারের মত তুমি আমাকে গলে পরিয়াছিলে, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি মানুষ, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি পশুর অধম, তাই বেশ্যার সম্মুখে এমনভাবে আমার অপমান করিতে তোমার লজ্জা হইল না।"

নন্দকিশোর লাফাইয়া উঠিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "চোপ্‌রহ হারামজাদি, পুরুত ঠাকুরের বিধবা কন্যা, কাঁচ-কলা ও আতপ চাউল ছাড়া মণিমুক্তা, জহরতের গহনা, এত সুখ, ঐশ্বর্য্য তোর সহ্য হইবে কেন? তাই এমন বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিস্, আমার ভাত কাপড়ে মানুষ হইয়া ভদ্র-লোকের মেয়ের সম্মুখে আমারই অপমান? যদি ইহার উচিত প্রতিফল না দিই ত আমি নন্দকিশোর শর্ম্মা নই।"

এই কঠিন কথা শুনিয়া রূপমঞ্জরী আর কোন উত্তর করিল না, নত মস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল; তাহার মনে হইল, জননী বসুমতী যদি দ্বিখণ্ডিতা হইয়া তাহাকে গ্রহণ করেন তবে সেই পৃথিবীগর্ভে তাহার স্থান হইতে পারে, আর কোথাও তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে রূপমঞ্জরী দেখিল, সে সেই বাগানবাটীতে একাকিনী পড়িয়া আছে। দাসদাসী, দ্বারবান কেহ কোথাও নাই, তাহার গহনার বাক্স, তাহার মূল্যবান বস্ত্রপূর্ণ পোর্টম্যাণ্ট, সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে। একবস্ত্রা, বিধবা, কলঙ্কিনী যুবতী ধনজনপূর্ণ সুবৃহৎ ভারত-রাজধানীর উপকণ্ঠে একটি পরিত্যক্ত, নিভৃত বাগানবাটীতে একাকিনী, নিতান্ত অসহায়া এবং সম্বলহীনা।

উঠিয়া সে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তুচ্ছ একটা কথা লইয়া মানুষ যে মানুষের প্রতি এমন কঠিন দণ্ডবিধান করিতে পারে, একথা কোন দিনও তাহার বিশ্বাস হয় নাই, সমস্ত জীবনের ঘটনা আগাগোড়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, দুঃখময় জীবন একটি অতি জটিল ভ্রম ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই তাহার ধারণা হইল না। সে আছড়াইয়া পড়িয়া সেই বিজনগৃহ ধ্বনিতকরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ; হায়, তাহার কি দুঃখ তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবারও একটা লোক নাই !

* * * * * * *

অতঃপর কি হইল তাহার উল্লেখ না করিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকি[illegible] [illegible]য়, সুতরাং সে পাপকাহিনীও আমরা এখানে বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম। রূপমঞ্জরী

যখন দেখিল জগতে তাহার আপনার বলিতে আর কিছুই নাই, পরদিন কি খাইবে তাহার পর্য্যন্ত সংস্থান নাই, এবং এই বিপুল পৃথিবীর অনন্ত কর্ম্মস্রোতের মধ্যে তাহার কোন কর্ম্ম নাই, তখন সে আপনার উদরান্ন সংগ্রহের জন্য এক বৃদ্ধার সাহায্যে অতি সহজে মহানগরী কলিকাতার রূপের বিপণিতে আপনার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইল।—নিজের রূপের প্রতি রূপমঞ্জরীর যে অগাধ বিশ্বাস ও অন্ধ অনুরাগ ছিল, এতদিনে সে তাহার ফল লাভ করিল।

এই পৈশাচিক বৃত্তির উপর রূপমঞ্জরীর আন্তরিক ঘৃণা ছিল, কিন্তু নিরুপায়! যে কলঙ্কিনী অন্নবস্ত্রে তাহার প্রতিপালন ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, রূপমঞ্জরীর এই বিতৃষ্ণা তাহার সহ্য হইল না, সে প্রথমে অনুযোগ তাহার পর তাড়না ও নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। রূপমঞ্জরীও দেখিল চক্ষুলজ্জাতে আর লাভ নাই, প্রতিদিন তাহার সম্মুখে তাহার মত কত রূপসী যুবতী, কত অস্ফুটযৌবনা কুমারী, কত বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়া নানা সাজে সজ্জিত হইয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে; তাহাদের কি চপল উল্লাস-হাস্য, কি বিপুল সুখকল্লোল, কি প্রমত্ত যৌবনচাঞ্চল্য! সে বুঝিল তাহার অদৃষ্টেও ইহা আছে, যাহা অদৃষ্টে লেখা আছে তাহা হইবেই; তাই যে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সে সতের বৎসর বয়সে কলঙ্কসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল, সেই

অদৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক আজ বিশ বৎসর বয়সে সে ডুবিতে বসিল।

অবশেষে রূপমঞ্জরী, তাহার পতনের নিম্নতম সোপানে উপনীত হইলে, কত দিন বর্ষার সিক্ত সন্ধ্যায় এবং পৌষের প্রচণ্ড হিমযামিনীতে মুখে পাউডার, চক্ষে অঞ্জন, ও উভয় করতলে অলক্ত লেপন পূর্ব্বক তাম্বুলরাগে ওষ্ঠাধর সুরঞ্জিত করিয়া একখানি রঙ্গিন কাপড় পরিয়া কলিকাতার এক দুর্গন্ধদূষিত অপ্রশস্ত পথের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকার দ্বারদেশে কোন উন্মার্গগামী নৈশ-নায়কের সমাগম প্রত্যাশায় একখানি ছোট টুলের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া থাকিত, কখন তাহার মস্তকের উপর দিয়া দুই এক পশলা বৃষ্টি চলিয়া যাইত, শীতের রাত্রে প্রবল হিমে তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া উঠিত, কিন্তু তথাপি তাহার বিদীর্ণ হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ হাহাকার, তাহার অশান্তিসন্তপ্ত কলুষিত প্রাণের সমস্ত সন্তাপ সে তাহার অসংযত, কপটতাপূর্ণ, চপল হাস্যতরঙ্গে আচ্ছন্ন করিয়া কাল-ক্ষেপণ করিত। ক্রমে একটা কৃত্রিম ছলনাবন্ধনে সে তাহার ঘাতসহ জীবনটাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বৈচিত্র্য-বিহীন করিয়া তুলিল, সে নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করে, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত কেশবিন্যাস করে, একখানি সূক্ষ্ম সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে ছাদের উপর তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের রূপরাশি সম্যক্ উদ্ঘাটিত করিয়া

দীর্ঘ বেণী দুলাইয়া সখীদের সঙ্গে কত সুখের গল্প করে, তুচ্ছ কথা লইয়া হাসিয়া কোন সহচরীর গায়ে ঢলিয়া পড়ে, এবং কখন কখন একখানি বাঁধানো বই লইয়া পড়িবার ভঙ্গীতে নাড়াচাড়া করে, যেন সে কোন অলিখিতপূর্ব্ব, প্রেমবৈচিত্র্যস্ফুরিত সত্যকার উপন্যাসের নবীনা নায়িকা; চক্ষে উজ্জ্বল কটাক্ষবহ্নি, হৃদয়ে উদ্দাম ভোগলালসা, এবং সর্ব্বাঙ্গে দুর্দ্দমনীয় অধীর উন্মত্ততা লইয়া দৃপ্ত যৌবনের শূন্য সিংহাসনে কুসুমায়ুধের সম্মোহন শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক যেন সে আগ্রহভরে কোন অভিসারোন্মুখ প্রণয়ীর প্রতীক্ষা করিতেছে; দেখিয়া মনে হয়, বুঝি তাহার হৃদয়ে সুখের, তাহার মনে আনন্দের, তাহার প্রাণে শান্তির সীমা নাই, যেন এই সংসার সমুদ্রে সে সদাচঞ্চল সুখতরঙ্গের ফেনময় কিরীট, কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে এইরূপে সে উন্মত্ত আবেগে উন্মুক্ত পথে পতনের রসাতল-গর্ভে ভাসিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া প্রতি দিন সে আপনাকে ও অন্যকে প্রতারিত করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার হীনতা, কলঙ্ক ও দৈন্যের কথা কি সে সত্যই ভুলিয়াছিল?— এক এক সময়ে সে কিছুতেই নিজের নিকট আত্মগোপন করিতে পারিত না, যেদিন দেখিত রাত্রে আমোদাকাঙ্ক্ষী কোন রসিক নায়ক তাহার শারীরিক অসুস্থতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাকে গান গাহিবার

জন্য উত্যক্ত করিতেছে, যেদিন সে বুঝিত, যে, বিবি মানসিক কষ্ট সত্ত্বেও উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি কপট হাস্যে নিম্নে সংগুপ্ত রাখিয়া, চটুল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, ন পরিচিত রসলিপ্সু আগন্তুকের উপর কৃত্রিম প্রেমজা বিস্তার পূর্ব্বক তাহার সহিত রসালাপ না করিলে পরদি প্রভাতে তাহার অন্নের সংস্থান হইবে না, সেদিন তাহা পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইত। সেদিন সে অতি কঠোর ভাবে অনুভব করিত তাহার জীবন কি নির্ম্মম দুর্ব্বিসহ অভিসম্পাতের সমষ্টি! তাই এক এক দিন গভী রাত্রে সে তাহার গৃহের দীপালোক নির্ব্বাণ করিয়া, নিজে গাত্র হইতে কলঙ্কার্জ্জিত সমস্ত অলঙ্কার দূরে ছুড়িয় ফেলিয়া, একাকিনী বিছানায় পড়িয়া ছিন্নকণ্ঠা বিহঙ্গিনী ন্যায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে থাকিত, কিন্তু তাহার অশ্রু প্রবাহে তাহার প্রেমহীন, নিরাশাতাড়িত, অসহায় জীব নের হৃদয়ভেদী হাহাকার ধৌত হইত না; তাহার সহ যোগিনীবর্গের কোন কোন গৃহ হইতে হয় ত তখনে তবলার শব্দ, আমোদপিপাসু চরিত্রহীন মদ্যপের স্খলি সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইত, কিন্তু রূপমঞ্জরীর নিকট তাহ প্রেতলোকের বীভৎস পৈশাচিক কোলাহল ভিন্ন অন কিছু বোধ হইত না। এইরূপে পৃথিবীর পবিত্রতা, পারি বারিক শান্তি ও সুপ্তির সুকোমল ক্রোড়-নির্ব্বাসিতা দুর্ভ গিনী অনাথা যুবতী কলিকাতার এক জীর্ণ অট্টালিকা

অভ্যন্তরে বসিয়া একাকিনী জীবনের সুকঠোর দিনগুলি
অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

কিন্তু এই ঘৃণিত জীবনের অসহনীয় কষ্ট অধিক কাল
সে সহ্য করিতে পারিল না, আপনার ভ্রান্তি সে সম্পূর্ণরূপে
উপলব্ধি করিয়াছিল, তিল তিল করিয়া তাহার প্রাণ বহির্গত
হইতেছিল, জীবনের প্রতি তাহার আসক্তি বিলুপ্ত হইয়া-
ছিল। একদিন প্রভাতে তাহার সহযোগিনীবর্গ সবিস্ময়ে
জানিল, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! তাহার অশান্ত
প্রাণ মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই উদ্বন্ধনরজ্জুর সহিত
দ্বন্দ্ব করিয়া অবশেষে পরাহত শক্তি লইয়া এই শোকতাপ
এবং বাসনা ও ভ্রান্তির উর্দ্ধে লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল
বটে, কিন্তু তখনো তাহার মরণাহত জীবনের অবিমিশ্র
তীব্র অনুতাপ তাহার বিশীর্ণ বিবর্ণ ওষ্ঠে এবং রুদ্ধদল
কমলের ন্যায় মুদ্রিত নেত্রে প্রতিফলিত হইতেছিল। ইহ-
জীবনে সে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, পরকালে যেন
ভগবানের চিরকল্যাণময় শান্তি ও করুণাকণা হইতে বঞ্চিত
না হয়, এই আশায় সে সেই বিশ্বমূলাধার করুণাময় বিধা-
তার উদ্দেশে তাহার কলঙ্কমলিন পাণিদ্বয় একবার সংযো-
জিত করিয়াছিল। কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর প্রবলদ্বন্দ্বে তাহার
মুখ হইতে একটি কথাও ফুটিতে পায় নাই; কেবল একটি
মাত্র অন্তিম দীর্ঘশ্বাসকে এই প্রেমদীপ্তিহীন, কলঙ্কলাঞ্ছিত
কঠোর জীবনের অবসানকালে চিররহস্যময়, অন্ধকার-

সমাচ্ছন্ন, বিস্মৃতি-সমাকুল সুদীর্ঘ মরণপথের অন্তিম পা
রূপে গ্রহণকরিয়া একটি কলঙ্কিত পতিত আত্মা অকা
ইহলোক হইতে অপসৃত হইল। অসংযত বাসনার কুহ
পড়িয়া তাহার সুখশান্তিবিচ্যুত সংক্ষিপ্ত জীবনের এ
শোচনীয় ভ্রান্তির জন্য সে ইহলোকে কোন মনুষে
সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই; তাহার পাপমলি
ঘৃণিত জীবন বিসর্জ্জনের পর পরলোকেও কি ভগবান তাহ
কলুষিত আত্মার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিবেন?

সমাপ্ত।